ছিল। কারণ এই যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে দ্বিতীয় কীবতী কিছুই জানত না। এমতাবস্থায় সে এর খবর কিরূপে দিতে পারে। এ খবর তো একমাত্র ঝগড়াকারী ইসরাঈলী ব্যক্তিই জানত।

মুআবিয়া (রা) হাদীসে বর্ণিত এ ঘটনা মেনে নিতে অস্বীকৃত হলে ইবনে আব্বাস (রা) রাগান্বিত হলেন এবং মুআবিয়ার হাত ধরে তাকে সা'দ ইবনে মালেক যুহরীর কাছে নিয়ে গেলেন। অতঃপর তাকে বললেন ঃ হে আবূ ইসহাক, তোমার স্মরণ আছে কি, যখন আমাদের কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা) মূসা (আ)-র হাতে নিহত কিবতীর হাদীস বর্ণনা করছিলেন, তখন এই গোপন ভেদ ফাঁসকারী ও হত্যাকারীর সন্ধানদাতা ইসরাঈলী ছিল, না দ্বিতীয় কিবতী ? সা'দ ইবনে মালেক বললেন ঃ দ্বিতীয় কিবতীই ঘটনা ফাঁস করেছিল। কেননা সে ইসরাঈলীর মুখে এ কথা শুনেছিল যে, গতকালকের হত্যাকাণ্ড মূসা (আ) কর্তৃক সংঘটিত হয়েছে। সে-ই ফিরাউনের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিল। ইমাম নাসায়ী এই বিস্তারিত হাদীসটি 'সুনানে কুবরা' গ্রন্থে তফসীর অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন।

এই হাদীসটি ইবনে জরীর তাবারী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আবী হাতেম তাঁর তফসীর গ্রন্থে ইয়াযিদ ইবনে হারূনের সনদ দ্বারাই উদ্ধৃত করে বলেছেন ঃ হাদীসটি রসূলুল্লাহ্ (স)-র ভাষ্য নয়; বরং ইবনে আব্বাসের নিজের কথা। তিনি একে কা'ব আহ্বারের ঐ সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গ্রহণ করেছেন, যেগুলো উদ্ধৃত করা ও বর্ণনা করা বৈধ রাখা হয়েছে। তবে এতে কোথাও কোথাও রসূলুল্লাহ্ (স)-র বাক্যাবলীও সংযুক্ত হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর তফসীর গ্রন্থে আদ্যোপান্ত হাদীস ও তার ওপর গবেষণা ও সত্যায়ন লিপিবদ্ধ করার পর বলেন ঃ আমাদের শ্রদ্ধেয় শায়খ আবুল হাজ্জাজ মিযযী, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেমের ন্যায় হাদীসটিকে মওকূফ অর্থাৎ ইবনে আব্বাসের ভাষ্য বলতেন।

উল্লিখিত কাহিনী থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, শিক্ষা ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ কোরআন পাক মূসা (আ)-র কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই কাহিনীতে হাজার হাজার শিক্ষা, রহস্য ও আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ শামিল হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ঈমান সুদৃঢ় হয়। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশাবলীও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সূরায় কাহিনীটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে ; তাই এর শিক্ষা, উপদেশ ও নির্দেশাবলীর কিছু অংশও প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ফিরাউনের বোকাসুলভ চেষ্টা-তদবীর এবং প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ তা'আলার বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ঃ ফিরাউন যখন জানতে পারল যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে, তখন সে ইসরাঈলী ছেলে সন্তানদের জন্মরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ জারি করে দিল। এরপর জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলেমেয়েদেরকে জীবিত রাখার

এবং পরবর্তী বছরের ছেলেমেয়েদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যে বছর ছেলেদেরকে জীবিত ছেড়ে দেওয়া হত, সেই বছর মূসা (আ)-কে জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলার ছিল; কিন্তু নির্বোধ ফিরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা ও তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় সন্তান হত্যার বছরেই মূসা (আ)-কে ভূমিষ্ঠ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালেন, যাতে মূসা (আ) স্বয়ং এই আল্লাহ্দ্রোহী জালিমের গৃহে লালিত-পালিত হন। ফিরাউন ও তার স্ত্রী পরম ঔৎসুক্যের সাথে তাকে নিজেদের গৃহে লালন-পালন করল। সারা দেশের ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানরা মূসা সন্দেহে নিহত হচ্ছিল, আর মূসা (আ) স্বয়ং ফিরাউনের গৃহে আরাম-আয়েশ ও আদর-যত্নের সাথে বয়সের সিড়ি অতিক্রম করছিলেন।

در بسته بند و دشمن اندر خانه بود
حیلهٔ فرعون زین افسانه بود

(দরজা বন্ধ করে দিল, অথচ শত্রু ভিতরেই রয়ে গেল। ফিরাউনের পরিকল্পনা এই কাহিনীরই প্রতিচ্ছবি।)

মূসা-জননীর প্রতি অলৌকিক নিয়ামত এবং ফিরাউনী পরিকল্পনার আরও একটি প্রতিশোধঃ মূসা (আ) যদি সাধারণ শিশুদের ন্যায় কোন ধাত্রীর দুধ কবূল করতেন, তবে তাঁর লালন-পালন শত্রু ফিরাউনের গৃহে এরপরও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে হত। কিন্তু তাঁর মাতা তাঁর বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং মূসা (আ)-ও কোন কাফির মহিলার দুধ পেতেন। আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে তাঁর পয়গম্বরকে কাফির মহিলার দুধ থেকেও বাঁচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তাঁর মাতাকেও বিরহের জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন; মুক্তিও এমনভাবে দিলেন যে, ফিরাউনের পরিবার তাঁর কাছে ঋণী হয়ে রইল এবং উপঢৌকন ও উপহারের বৃষ্টিও বর্ষিত হল। নিজেরই প্রাণপ্রতিম সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর বিনিময়ে মূসা-জননী ফিরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেলেন এবং ফিরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় থাকতে হল না। فتبارك الله احسن الخالقين

শিল্পপতি, ব্যবসায়ী প্রমুখদের জন্যে একটি সুসংবাদঃ এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ যে শিল্পপতি তার শিল্পকাজে সওয়াবের নিয়ত রাখে, সে মূসা (আ)-র জননীর ন্যায়। তিনি আপন শিশুকেই দুধ পান করিয়ে অপরের কাছ থেকে ভাতা পেয়েছেন। (ইবনে কাসীর) উদ্দেশ্য এই যে, কোন রাজমিস্ত্রী মসজিদ, খানকাহ, মাদ্রাসা অথবা কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণকালে যদি শুধু মজুরী ও পয়সা উপার্জনের নিয়ত করে, তবে সে তাই পাবে। কিন্তু যদি সে এরূপ নিয়তও করে যে, এই নির্মাণকাজ সৎ কাজে নিয়োজিত হবে, এর দ্বারা ধার্মিক ব্যক্তিরা উপকৃত হবে---এজন্য এ কাজকে সে অন্য কাজের ওপর অগ্রাধিকার দেয় তবে সে মূসা জননীর ন্যায় মজুরীও পাবে এবং ধর্মীয় উপকারও লাভ করবে।

আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দারা প্রেমাস্পদসুলভ মাধুর্য প্রাপ্ত হন, তাদেরকে যে-ই দেখে, সে-ই মহব্বত করেঃ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ---আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ বান্দাদেরকে বিশেষ এক প্রকার প্রেমাস্পদসুলভ সৌন্দর্য দান করেন। ফলে তাদেরকে দেখে আপন, পর, শত্রু, মিত্র সবাই মহব্বত করতে থাকে। পয়গম্বরদের স্তর অনেক উর্ধ্বে, অনেক ওলীর মধ্যেও এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।

মূসা (আ)-র হাতে ফিরাউনী কাফিরের হত্যাকে 'ভুলক্রমে হত্যা' কেন সাব্যস্ত করা হলঃ মূসা (আ) জনৈক ইসরাঈলী মুসলমানকে ফিরাউনী কাফিরের সাথে লড়াইরত দেখে ফিরাউনীকে ঘুষি মারলেন; ফলে সে প্রাণত্যাগ করল। মূসা (আ) নিজেও এ কাজকে 'শয়তানের কাজ' আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমাও করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি আইনগত প্রশ্ন এই দেখা দেয় যে, ফিরাউনী ব্যক্তি কাফির হরবী ছিল। তার সাথে মূসা (আ)-র কোন শান্তিচুক্তি ছিল না এবং তাকে যিম্মী কাফিরদের তালিকাভুক্তও করা যেত না, যাদের জানমাল ও সম্মানের হিফাযত করা মুসলমানদের দায়িত্বে ওয়াজিব। সে ছিল একান্তই হরবী কাফির। ইসলামী শরীয়তের আইনে এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা গোনাহ্ নয়। এমতাবস্থায় এ হত্যাকে শয়তানের কাজ ও ভুল কি কারণে সাব্যস্ত করা হল?

বিশিষ্ট তফসীর গ্রন্থসমূহে কেউ কেউ এ প্রশ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। আমি যখন হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-র নির্দেশে 'আহ্‌কামুল কোরআন' গ্রন্থের রচনায় ব্যস্ত ছিলাম, তখন এ প্রশ্ন উত্থাপন করায় তিনি উত্তরে বললেনঃ এ কথা ঠিক যে, এই ফিরাউনী কাফিরের সাথে সরাসরি ও প্রকাশ্য কোন শান্তি-চুক্তি অথবা যিম্মী হওয়ার চুক্তি ছিল না; কিন্তু তখন মূসা (আ)-রও রাজত্ব ছিল না এবং সেই ফিরাউনীরও ছিল না। বরং তারা উভয়েই ফিরাউনের রাজত্বে নাগরিক ছিল এবং একজন অপরজনের পক্ষ থেকে নিরাপদ ছিল। এটা ছিল এক প্রকার অলিখিত কার্যগত চুক্তি। ফিরাউনীকে হত্যার ফলে এই কার্যগত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ হয়েছে। তাই একে 'ভুলক্রমে হত্যা' সাব্যস্ত করা হয়েছে। ভুলটি যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয়---ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা মূসা (আ)-র নবুয়তের পবিত্রতার পরিপন্থী নয়।

এ কারণেই মাওলানা থানভী (র) অবিভক্ত ভারতে কোন মুসলমানের পক্ষে কোন হিন্দুর জানমালের ক্ষতি করা বৈধ মনে করতেন না। কেননা মুসলমান ও হিন্দু এ উভয় সম্প্রদায়ই ইংরেজদের রাজত্বে বাস করত।

অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা ইহকাল ও পরকালে উপকারীঃ হযরত মূসা (আ) মাদইয়ান শহরের উপকণ্ঠে দুইজন মহিলাকে দেখলেন যে, তারা অক্ষমতার কারণে

তাদের ছাগলকে পানি পান করাতে পারছে না। মহিলাদ্বয় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং মূসা (আ) একজন মুসাফির ছিলেন। কিন্তু অক্ষমদের সেবা ভদ্রতা ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার কাছেও পছন্দনীয় কাজ ছিল। তাই তিনি তাদের জন্য পরিশ্রম স্বীকার করলেন এবং তাদের ছাগলকে পানি পান করিয়ে দিলেন। এ কাজের সওয়াব ও পুরস্কার আল্লাহ্র কাছে বিরাট। দুনিয়াতেও তাঁর এ কাজকেই প্রবাস জীবনের অসহায়ত্ব ও সম্বলহীনতার প্রতিকার সাব্যস্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে নিজের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ তিনি এর মাধ্যমেই লাভ করেন এবং হযরত শুআয়ব (আ)-এর সেবা ও তাঁর জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর তাঁর মাতাকে যে দায়িত্ব পালন করতে হত, আল্লাহ্ তা'আলা প্রবাস জীবনে তা একজন পয়গম্বরের হাতে সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছেন।

দুই পয়গম্বরের মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক ঃ এর রহস্য ও অভাবনীয় উপকারিতা ঃ মূসা (আ) শুআয়ব (আ)-এর গৃহে অতিথি হয়ে ফিরাউনী সিপাহীদের কবল থেকে নিশ্চিন্ত হলে শুআয়ব (আ) কন্যার পরামর্শক্রমে তাঁকে চাকর রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এতে আল্লাহ্র অনেক হিকমত এবং মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিদায়ত নিহিত আছে।

প্রথমত শুআয়ব (আ) আল্লাহ্র নবী ও রসূল ছিলেন। একজন প্রবাসী মুসাফিরকে চাকুরীর বিনিময় ছাড়াই কিছুদিন নিজ গৃহে আশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই দুষ্কর ছিল না। কিন্তু তিনি সম্ভবত পয়গম্বরসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এ কথা বুঝে নিয়েছিলেন যে, সৎসাহসী মূসা (আ) এ ধরনের আতিথ্য কবুল করবেন না এবং অন্যত্র চলে গেলে বিপদগ্রস্ত হবেন। তাই সকল প্রকার লৌকিকতা পরিহার করে লেনদেনের পথ বেছে নিলেন। এতে অপরের জন্যেও নির্দেশ রয়েছে যে, অন্যের গৃহে গিয়ে তার গলগ্রহ হয়ে যাওয়া ভদ্রতার খেলাপ।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে রিসালত ও নবুয়ত দ্বারা ভূষিত করতে চাইতেন। এর জন্য যদিও কোনরূপ সাধনা ও কর্ম শর্ত নয় এবং কোন সাধনা ও কর্ম দ্বারা তা অর্জনও করা যায় না, কিন্তু আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি পয়গম্বরদেরকেও সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পথে পরিচালনা করেন। কেননা এটা মানব চরিত্রের উৎকর্ষের উপায় এবং অপরের সংশোধনের প্রধান কারণ হয়ে থাকে। মূসা (আ)-র জীবন এ পর্যন্ত রাজকীয় সম্মান ও জাঁকজমকের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে তাঁকে জনগণের পথপ্রদর্শক ও সংস্কারকের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে হবে। শুআয়ব (আ)-র সাথে শ্রম ও মজুরীর এই চুক্তিতে তাঁর চারিত্রিক লালন-পালনের গোপন ভেদও নিহিত ছিল। সাধক শিরাজী তাই বলেন ঃ

شبان وادیٔ ایمن گہے رسد بمراد
کہ چند سال بجاں خدمت شعیب کند

তৃতীয়ত মূসা (আ)-র কাছ থেকে ছাগল চরানোর কাজ নেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ পয়গম্বরকে এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। ছাগল সাধারণত পাল থেকে আলাদা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে। ফলে রাখালের মনে বারবার ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে যদি পলাতক ছাগল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে ছাগল হাতছাড়া হয়ে কোন ব্যাঘ্রের খোরাকে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছামত পরিচালনা করার জন্য যদি রাখাল ছাগলকে মারপিট করে, ক্ষীণকায় জন্তু হওয়ার কারণে হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ কারণে রাখালকে অত্যধিক ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। পয়গম্বরগণের সাথে সাধারণ মানব সমাজের ব্যবহারও তদ্রূপ হয়ে থাকে। এতে পয়গম্বরগণ তাদের তরফ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেও পারেন না এবং তাদেরকে কঠোরতার মাধ্যমেও পথে আনতে পারেন না। ফলে ধৈর্য ও সহনশীলতার অভ্যাসের পথই তাদেরকে অবলম্বন করতে হয়।

কাউকে কোন পদ ও চাকুরী দান করার চমৎকার মাপকাঠি ঃ এই কাহিনীতে শুআয়ব (আ)-এর কন্যা পিতাকে পরামর্শ দিয়েছে যে, তাকে চাকর রাখা হোক। এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে সে বলেছে যে, শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিই সর্বোত্তম চাকর হতে পারে। 'শক্তিশালী' বলে এখানে অর্পিত কাজের শক্তি ও যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে এবং 'বিশ্বস্ত' বলে বোঝানো হয়েছে যে, তার সাবেক জীবনের অবস্থা তার সততা ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দেয়। আজকাল বিভিন্ন চাকুরী এবং সরকারী ও বেসরকারী পদের জন্য প্রার্থী বাছাই করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর মধ্যে যেসব গুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তা সবই উপরোক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। বরং প্রচলিত বাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত শর্তাবলীর মধ্যে উপরোক্ত বিষয়াদি সাধারণত পূর্ণরূপে অনুসরণ করা হয় না। কেননা সততা ও বিশ্বস্ততা আজকাল কোথাও বিবেচ্য বিষয়রূপে পরিগণিত হয় না; শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতার ডিগ্রীকেই মাপকাঠি ধরা হয়। আজকাল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনায় যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হয়, তার অধিকাংশই এই সততা বিষয়ক মূলনীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনেরই ফল। শিক্ষার দিক দিয়ে যোগ্য ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততা গুণ না থাকে, তবে সে কারচুপি ও ঘুষখোরীর এমন অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সিদ্ধহস্ত হয়, যা আইনের আওতায় পড়ে না। এ দোষটিই আজ বিশ্বের অধিকাংশ সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকেজো বরং ক্ষতিকর করে রেখেছে। এ কারণেই ইসলামী ব্যবস্থায় এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার সুফল বহু শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

যাদুকর ও পয়গম্বরদের কাজে সুস্পষ্ট পার্থক্য ঃ ফিরাউন সমবেত যাদুকরদেরকে দেশ ও জাতির বিপদাশংকা সামনে রেখে কাজ করতে বলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে একে নিজের কাজ মনে করে আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তারা কি করেছে? কাজ শুরু করার আগেই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দরকষাকষি আরম্ভ করে দিয়েছে।

এর বিপরীতে আল্লাহ্-প্রেরিত পয়গম্বরগণ সব মানুষের সামনে এই ঘোষণা রাখেন ঃ وَلَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ---অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। পয়গম্বরগণের প্রচার ও দাওয়াত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রভাব অত্যধিক। ইসলামী বায়তুল মাল থেকে আলিম, মুফতী ও ওয়ায়েযদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে তারা শিক্ষাদান, ওয়ায ও ইমামতির বেতন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বেতন গ্রহণ পরবর্তী ফিকাহ্‌বিদদের মতে অপারগ অবস্থায় জায়েয হলেও জনগণের সংস্কারের ক্ষেত্রে এর কুফল অস্বীকার করার উপায় নেই। বলা বাহুল্য বিনিময় গ্রহণের ফলে তাদের প্রচেষ্টার উপকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ফিরাউনী যাদুকরদের যাদুর স্বরূপ ঃ ফিরাউনী যাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে বাহ্যত সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল। প্রশ্ন এই যে, এগুলো কি বাস্তবিকই সাপ হয়ে গিয়েছিল? এ সম্পর্কে কোরআন পাকের ভাষা يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ---(যাদুর কারণে এগুলো ইতস্তত ছুটাছুটি করছে বলে মনে হচ্ছিল) থেকে জানা যায় যে, এগুলো সত্যিকার সাপ হয়ে যায় নি; বরং যাদুকররা এক প্রকার মেসমেরিজমের মাধ্যমে দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে নজরবন্দী করে দিয়েছিল। ফলে এগুলো দর্শকদের কাছে ছুটাছুটিরত সাপ মনে হচ্ছিল।

অবশ্য এ দ্বারা এটা জরুরী নয় যে, যাদুবলে বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে না। এখানে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ফিরাউনী যাদুকরদের যাদু বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করার মত শক্তিশালী ছিল না।

গোত্রগত বিভক্তি সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত নিন্দনীয় নয় ঃ ইসলাম দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও গোত্রগত বিভেদকে জাতীয়তার ভিত্তি স্থির করার তীব্র নিন্দা করেছে এবং এসব বিভেদ মিটানোর জন্যে প্রতি কাজে ও প্রতি পদক্ষেপে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এতে আরবী, আজমী, ফারসী, হিন্দী ও সিন্ধী সবাই এক জাতির ব্যক্তিবর্গ। বিশ্বনবী (সা) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করার জন্যে সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে এই কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন যে, আঞ্চলিক, বংশগত ও ভাষাগত বিভেদের মূর্তিকে ইসলাম ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। এতদসত্ত্বেও সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত এসব পার্থক্যকে মূল্য দেওয়ার অনুমতি ইসলামে আছে। কেননা,

বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পানাহার ও বসবাসের পদ্ধতি বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। এগুলোর বিপরীত করা খুবই কষ্টকর কাজ।

হযরত মূসা (আ) যে বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিলেন, তারা বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এসব গোত্রের পার্থক্যকে সামাজিক কাজ-কারবারে বৈধ রাখেন। ফলে দরিয়ার মধ্যেও প্রত্যেক গোত্রের জন্য অলৌকিকভাবে আলাদা বারটি রাস্তা প্রকাশ করে দেন। এমনিভাবে তীহ্ প্রান্তরে পাথর থেকেও অলৌকিকভাবে আলাদা আলাদা বারটি ঝরনা প্রবাহিত করে দেন, যাতে গোত্রসমূহের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি না হয় এবং প্রত্যেক গোত্র তার নির্ধারিত পানি লাভ করতে পারে। و الله اعلم

সমষ্টিগত শৃঙ্খলা বিধানের জন্য স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করাঃ মূসা (আ) এক মাসের জন্য তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়ে তূর পর্বতে ইবাদতে মশগুল হতে চেয়েছিলেন। তখন হারূন (আ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে সবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা তার আনুগত্য করবে। পারস্পরিক মতভেদ ও অনৈক্য রোধ করাই ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। এ থেকে জানা যায় যে, কোন রাষ্ট্র, দল ও পরিবারের প্রধান যদি বিদেশ সফরে গমন করে, তবে প্রশাসনযন্ত্র চালু রাখার জন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যাওয়া পয়গম্বরদের সুন্নত।

মুসলমানদের দলে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিরাটতম মন্দকে সাময়িকভাবে বরদাশত করা যায়ঃ মূসা (আ)-র অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজা অনর্থ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হারূন (আ) সবাইকে সত্যের দাওয়াত দেন, কিন্তু মূসা (আ)-র ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কোন দলের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন নি। এতে মূসা (আ) ক্রুদ্ধ হলে তিনি এই অজুহাতই পেশ করেন যে, আমি কঠোরতায় অবতীর্ণ হলে বনী ইসরাঈল শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।

اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ

—অর্থাৎ আমি কোন দল থেকেই কঠোরভাবে বিভিন্নতা ও নিস্পৃহতার কথা ঘোষণা করিনি; কারণ তাহলে আপনি ফিরে এসে আমাকে অভিযুক্ত করে বলতেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমার নির্দেশ পালন কর নি।

মূসা (আ)-ও তাঁর অজুহাতকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন নি, বরং সঠিক মেনে নিয়ে তাঁর জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য সাময়িকভাবে কোন মন্দ কাজের ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করলে তা দুরস্ত হবে। و الله سبحانه اعلم

মূসা (আ)-র কাহিনীর উপরোল্লিখিত হেদায়েতসমূহের শেষে মূসা ও হারূন (আ)-কে একটি বিশেষ নিদর্শন সহকারে ফিরাউনকে পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। নির্দেশটি এই ঃ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ঃ এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অবাধ্য এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথপ্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙ্ক্ষার ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

ফিরাউন খোদায়ী-দাবীদার অত্যাচারী বাদশাহ্ ছিল এবং আপন সত্তার হেফাযতের জন্য বনী ইসরাঈলের হাজারো ছেলে-সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী ছিল। তার কাছেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বিশেষ পয়গম্বরদ্বয়কে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে সে চিন্তাভাবনার সুযোগ পায়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই জানতেন যে, ফিরাউন তার অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতা থেকে বিরত হবে না; কিন্তু যে নীতির মাধ্যমে মানবজাতি চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয় এবং আল্লাহ্‌ভীতির দিকে ফিরে আসে, পয়গম্বরগণকে সেই নীতির অনুসারী করা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ফিরাউন হেদায়েত লাভ করুক বা না করুক; কিন্তু নীতি এমন হওয়া চাই, যা হেদায়েত ও সংস্কারের উপায় হতে পারে।

আজকাল অনেক আলেম নিজেদের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে একে অপরের বিরুদ্ধে গালিগালাজ ও দোষারোপকে ইসলামের সেবা মনে করে বসেছে। তাদের এ বিষয়ে বিশদ চিন্তাভাবনা করা উচিত।

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا
إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ
مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ ۖ
وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴿٤٧﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ
مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٤٨﴾ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ
كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾

(৪৫) তারা বলল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। (৪৬) আল্লাহ্ বললেন ঃ

তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি। (৪৭) অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বলঃ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রসূল, অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে আগমন করেছি। এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি। (৪৮) আমরা ওহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার ওপর আযাব পড়বে। (৪৯) সে বলল ঃ তবে হে মূসা, তোমাদের পালনকর্তা কে? (৫০) মূসা বললেন ঃ আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন মূসা ও হারূন এই নির্দেশ পেলেন, তখন) উভয়ে আরয করলেন ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, (আমরা প্রচারের জন্য হাযির আছি; কিন্তু) আমরা আশংকা করি যে, (কোথাও) সে আমাদের প্রতি (প্রচারের পূর্বেই) জুলুম না করে বসে (ফলে প্রচারই না হয়) অথবা (ঠিক প্রচারের সময় কুফরে) মাত্রাতিরিক্ত সীমা লংঘন না করতে থাকে (যেন সাতসতেরো কথা বলে প্রচারিত বক্তব্য নিজেও না শোনে এবং অন্যকেও শুনতে না দেয়; যাতে তা প্রচার না করার অনুরূপ হয়ে যায়।) ইরশাদ হল ঃ (এ বিষয়ে) ভয় করো না, (কেননা) আমি তোমাদের সাথে আছি---সব শুনি এবং দেখি। (আমি তোমাদের হেফাযত করব এবং তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেব। ফলে তোমরা পূর্ণরূপে প্রচার করতে পারবে। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ نَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا) অতএব তোমরা (নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে) তার কাছে যাও এবং (তাকে) বল ঃ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রসূল (তিনি আমাদেরকে নবী করে প্রেরণ করেছেন)। অতএব (তুমি আমাদের আনুগত্য কর। তওহীদ মেনে নিয়ে বিশ্বাস সংশোধন কর এবং জুলুম থেকে বিরত হয়ে চরিত্র সংশোধন কর এবং) বনী ইসরাঈলকে (যাদের প্রতি তুমি অন্যায় জুলুম কর---জুলুমের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে) আমাদের সাথে যেতে দাও (তারা যেখানে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা থাকবে) এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা (শুধু শুধুই নবুয়ত দাবী করি না; বরং আমরা) তোমার কাছে তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে (নবুয়তের) নিদর্শন (অর্থাৎ মু'জিযাও) নিয়ে আগমন করেছি। (সত্যায়ন ও সত্য গ্রহণের সুফল এই সামগ্রিক নীতি দ্বারা জানা যাবে যে,) যে (সরল) পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি (খোদায়ী আযাব থেকে) শান্তি। (এবং মিথ্যারোপ ও সত্য প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে) আমরা ওহী লাভ করেছি যে, (আল্লাহ্‌র) আযাব ঐ ব্যক্তির ওপর পতিত হবে, যে (সত্যকে) মিথ্যারোপ করে এবং (তা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। (মোটকথা, এই পূর্ণ বিষয়বস্তু তাকে গিয়ে বল। সেমতে তাঁরা ফিরাউনের কাছে গেলেন এবং তাকে সব শুনিয়ে দিলেন।) সে বলল ঃ তবে হে মূসা (বল তো শুনি) তোমাদের

পালনকর্তা কে (তোমরা যার প্রেরিত রসূল বলে দাবী করছ? জওয়াবে) মূসা (আ) বললেনঃ আমাদের (বরং সবার) পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার উপযুক্ত আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর (তাদের মধ্যে যারা প্রাণী ছিল, তাদেরকে তাদের উপকারিতা ও উপযোগিতার প্রতি) পথ প্রদর্শন করেছেন। (তাই প্রত্যেক জন্তু তার উপযুক্ত খাদ্য, যুগল, বাসস্থান ইত্যাদি খুঁজে নেয়। সুতরাং তিনিই আমাদেরও পালনকর্তা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত মূসা (আ) কেন ভয় পেলেন? اِنَّنَا نَخَافُ ---মূসা ও হারূন (আ)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় اَنْ يَّفْرُطَ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফিরাউন সম্ভবত আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার পূর্বেই আমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। দ্বিতীয় ভয় اَنْ يَّطْغٰى শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবত সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরও বেশী অবাধ্যতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে মূসা (আ)-কে নবুয়ত ও রিসালত দান করা হলে তিনি হারূন (আ)-কে তাঁর সাথে শরীক করার আবেদন করেন। তাঁর এ আবেদন কবূল করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলে দেনঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا

অর্থাৎ আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবল করব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করেছ, সবই তোমাকে দান করলাম।

قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى---এসব প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে বক্ষ উন্মোচনও ছিল। বক্ষ উন্মোচনের সারমর্ম এই যে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি? এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে পারে এবং বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শোনা ও মু'জিযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশংকা এই যে, ফিরাউন কথা

শোনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উন্মোচনের জন্য স্বভাবগত ভয় দূর হয়ে যাওয়াও জরুরী নয়।

দ্বিতীয়ত, ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গম্বরের সুন্নত। এ ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং মূসা (আ) তাঁরই লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্ বললেনঃ لَا تَخَفْ ভয় করো না। অন্যান্য সব ভয়ের ক্ষেত্রে এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা সুসংবাদের মাধ্যমে দূর করেছেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গেই فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ এবং فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ আয়াতসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মানবগত ভয়ের কারণেই শেষনবী (সা) মদীনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহযাব যুদ্ধে এই ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্য পরিখা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বারবার এসেছিল। কিন্তু সত্য এই যে, আল্লাহ্র ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু মানবের স্বভাবগত তাকীদ অনুযায়ী যে স্বভাবজাত ভয় পয়গম্বরদের মধ্যেও দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়।

إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ----আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ মানবের উপলব্ধির বাইরে।

মূসা (আ) ফিরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী ইসরাঈলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেওয়ারও আহ্বান জানানঃ এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরগণ যেমন মানবজাতিকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব স্ব উম্মতকে পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কোরআন পাকে মূসা (আ)-র দাওয়াতে উভয় বস্তুটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করে প্রত্যেকের অস্তিত্বের উপযোগী নির্দেশ দিয়েছেন, ফলে সে তার কাজে নিয়োজিত হয়েছেঃ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে, এক প্রকার বিশেষ নির্দেশ হচ্ছে পয়গম্বরদের দায়িত্ব ও পরম কর্তব্য। জ্ঞানশীল মানব ও জিনই এই নির্দেশের পাত্র ও প্রতিপক্ষ। এছাড়া অন্য এক প্রকার সৃষ্টিগত নির্দেশও আছে। এই নির্দেশ সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা, বাতাস ও এদের সমন্বয়ে গঠিত প্রত্যেক বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ এক প্রকার চেতনা ও অনুভূতি দান করেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতি মানব ও জিনের সমান নয়। এ

কারণেই এই চেতনার অধিকারীদের ওপর হালাল ও হারামের বিধি-বিধান আরোপিত হয় না। এই অপূর্ণ চেতনা ও অনুভূতির পথেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তোকে অমুক কাজ করতে হবে। এই সৃষ্টিগত নির্দেশ অনুসরণ করে ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও এতদুভয়ের সব সৃজিত বস্তু নিজ নিজ কাজে ও আপন আপন কর্তব্যে নিয়োজিত রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য তাদের কাজ করছে। গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য তারকা আপন আপন কাজে এমনভাবে মশগুল আছে যে, এক মিনিট অথবা এক সেকেণ্ডও পার্থক্য হয় না। বাতাস, পানি, অগ্নি, মৃত্তিকা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণে ব্যাপৃত আছে এবং আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তাতে কেশাগ্র পরিমাণও ব্যতিক্রম করছে না। হাঁ, ব্যতিক্রমের নির্দেশ হলে কখনও অগ্নিও পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়; যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে হয়েছিল এবং কখনও পানি অগ্নির কাজ করতে থাকে, যেমন কওমে নূহের জন্য করেছিল। أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا (তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল)। জন্মের শুরুতে শিশুকে কথাবার্তা শিক্ষা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এমতাবস্থায় তাকে কে শিক্ষা দিল যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্য হাসিল করতে হবে এবং মায়ের স্তন চেপে ধরে দুধ চুষে নেওয়ার কৌশল তাকে কে বলে দিল? ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত ও গরমে ক্রন্দন করাই তার সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্রন্দন কে শিক্ষা দিল? এটাই আল্লাহ্র নির্দেশ, যা প্রত্যেক সৃষ্ট জীব তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন মোতাবেক অদৃশ্য জগৎ থেকেও কারও শিক্ষা ব্যতীত প্রাপ্ত হয়।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি ব্যাপক সৃষ্টিগত নির্দেশ প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের জন্য রয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্ট জীব সৃষ্টিগতভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ করে এবং এর বিপরীত করা তার সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয় নির্দেশ বিশেষভাবে জ্ঞানশীল জিন ও মানবের জন্য রয়েছে। এই নির্দেশ সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক নয়; বরং ইচ্ছাধীন। এই ইচ্ছার কারণেই মানব ও জিন সওয়াব অথবা আযাবের অধিকারী হয়।

أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ---আয়াতে প্রথমোক্ত প্রকার নির্দেশ বিধৃত হয়েছে। মূসা (আ) ফিরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার ঐ কাজের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ এ কাজ নিজে অথবা অন্য কোন মানব করেছে বলে দাবী করতে পারে না। ফিরাউন এ কথার কোন জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল তাবোল প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে গেল এবং মূসা (আ)-কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার সাত্যিকার জওয়াব জনসাধারণের শ্রুতিগোচর হলে তারা মূসা (আ)-র প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উম্মত ও জাতি প্রতিমা পূজা করত, আপনার মতে তারা কিরূপ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর উত্তরে মূসা (আ) অবশ্যই বলবেন যে, তারা সবাই গোমরাহ্ ও জাহান্নামী। তখন

ফিরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বকেই বেওকুফ, গোমরাহ্ ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা শুনে জনসাধারণ তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফিরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পয়গম্বর মূসা (আ) এ প্রশ্নের এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন, যার ফলে ফিরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى ﴿٥١﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتٰبٍ ۚ لَا يَضِلُّ
رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ﴿٥٢﴾ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا
سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۭ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى ﴿٥٣﴾
كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّهٰى ﴿٥٤﴾ مِنْهَا
خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ﴿٥٥﴾
وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى ﴿٥٦﴾ قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا
مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٥٧﴾ فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَآ اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾
قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

(৫১) ফিরাউন বলল ঃ তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি? (৫২) মূসা বলল ঃ তাদের খবর আমার পালনকর্তার কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না। (৫৩) তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলার পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (৫৪) তোমরা আহার কর এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু চরাও। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৫৫) এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং পুনরায় এ থেকেই তোমাদেরকে উত্থিত করব। (৫৬) আমি ফিরাউনকে আমার সব নিদর্শন দেখিয়ে দিয়েছি, অতঃপর সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। (৫৭) সে বলল ঃ হে মূসা তুমি কি যাদুর জোরে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করার জন্য আগমন করেছ? (৫৮) অতএব আমরাও তোমার মুকাবিলায় তোমার নিকট অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না একটি পরিষ্কার

প্রান্তরে। (৫৯) মূসা বলল ঃ তোমাদের ওয়াদার দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ফিরাউন (أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ আয়াতের বক্তব্যে সন্দেহ করল এবং) বলল ঃ আচ্ছা তা হলে বিগত যুগের লোকদের অবস্থা কি? (তারা তো পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত। তাদের ওপর কোন আযাব নাযিল হয়েছে?) মূসা (আ) বললেন ঃ (আমি এরূপ দাবী করিনি যে, সেই প্রতিশ্রুত আযাব দুনিয়াতেই আসবে; বরং তা কোন সময় দুনিয়াতেও আসে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই। সেমতে) তাদের (কুকর্মের) খবর আমার পালনকর্তার কাছে আমলনামায় (সংরক্ষিত) আছে (অবশ্য তার জন্য আমলনামার প্রয়োজন নেই; কিন্তু কোন কোন রহস্যের কারণে আমলনামাই রাখা হয়েছে। মোটকথা, তাদের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্ তা'আলার জানা আছে এবং) আমার পালনকর্তা (এমন জ্ঞানী যে,) ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। [সুতরাং তাদের ক্রিয়াকর্মের বিশুদ্ধ জ্ঞান তাঁর আছে। কিন্তু তিনি আযাবের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সময় এলেই তাদের ওপর আযাব জারি করা হবে। অতএব দুনিয়াতে আযাব না এলে জরুরী নয় যে, কুফর ও শিরক আযাবের কারণ নয়। এ পর্যন্ত মূসা (আ)-র বক্তব্য পেশ হল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পালনকর্তার কিছু বিবরণ দান করছেন। যার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মূসা (আ)-র এই বাক্যে ছিল ঃ

رَبُّنَا الَّذِيْ أَعْطَىٰ الخ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ الخ—عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ الخ

তাই ইরশাদ হচ্ছে যে,] তিনি (পালনকর্তা) তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা (সদৃশ) করেছেন, (তোমরা এর ওপর আরাম কর) এবং এতে তোমাদের (চলার) জন্য পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর আমি তা (পানি) দ্বারা বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি (এবং তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছি যে,) নিজেরা (ও) খাও এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদেরকে (ও) চরাও। (উল্লেখিত) এসব বস্তুর মধ্যে বিবেকবানদের (বোঝার) জন্য (আল্লাহ্র কুদরতের) নিদর্শনাবলী রয়েছে। (উদ্ভিদকে যেমন মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন করি, তেমনিভাবে) আমি তোমাদেরকে এ মাটি থেকেই (প্রথমে) সৃজন করেছি (আদম মৃত্তিকা থেকে সৃজিত হয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে সবার দূরবর্তী উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা।) এতেই আমি তোমাদেরকে (মৃত্যুর পর) ফিরিয়ে দেব (মৃত ব্যক্তি যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, দেরীতে হলেও পরিণামে মাটির সাথে মিশে যাবে।) এবং (কিয়ামতের দিন) পুনর্বার এ থেকেই আমি তোমাদেরকে বের করব।

আমি ফিরাউনকে আমার (ঐ) সব নিদর্শন দেখিয়েছি, [যা মূসা (আ)-কে দান করা হয়েছিল] অতঃপর সে মিথ্যাই আরোপ করেছে এবং অস্বীকারই করেছে।

সে বলল ঃ হে মূসা, তুমি আমাদের কাছে (এ দাবী নিয়ে) এজন্যে এসেছ যে, আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে যাদুর জোরে বহিষ্কার করে দেবে (এবং নিজে জনগণকে মুগ্ধ ও অনুগত করে সরদার হয়ে যাবে)। অতএব আমরাও তোমার মুকাবিলায় অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। তুমি আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর; যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না কোন সমতল ময়দানে (যাতে সবাই দেখে নেয়)। মূসা (আ) বললেন ঃ তোমাদের (মুকাবিলার) ওয়াদার দিন (তোমাদের) মেলার দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হয়ে যাবে। (বলা বাহুল্য, মেলার স্থান সমতল ভূমিই হয়ে থাকে। এতেই مكان سوى এর শর্তটিও পূর্ণ হয়ে যাবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى — ফিরাউন অতীত উম্মতদের পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে মূসা (আ) যদি পরিষ্কার বলে দিতেন যে, তারা গোমরাহ্ ও জাহান্নামী, তবে ফিরাউন এরূপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো শুধু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বকে গোমরাহ্ ও জাহান্নামী মনে করে। এ কথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও মূসা (আ)-র প্রতি সন্দেহ-পরায়ণ হয়ে যেত। মূসা (আ) এমন বিজ্ঞজনোচিত জওয়াব দিলেন যে, পূর্ণ বক্তব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফিরাউনও বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে 'সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙেনি।' তিনি বললেন ঃ তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে। আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করার অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى — أزواج শব্দের অর্থ হরেক রকম এবং شَتَّى শব্দটি شَتِيْتٌ এর বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতাগুল্ম, ফলফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্রবিশারদগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। فتبارك الله احسن الخالقين

—তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ

অর্থাৎ এতে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানদের জন্যে।

نُهَىٰ শব্দটি نُهْيَةٌ -এর বহুবচন। বিবেককে نُهْيَةٌ (নিষেধকারক) বলার কারণ এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে।

প্রত্যেক মানুষের খমিরে বীর্যের সাথে ঐ স্থানের মাটিও শামিল থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে ঃ مِنْهَا—مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ শব্দের সর্বনাম দ্বারা মৃত্তিকা বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এখানে সব মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে; অথচ এক আদম (আ) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা নয়, বীর্য দ্বারা সৃজিত হয়েছে। আদম (আ)-এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে 'তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি' বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হযরত আদম (আ)। তাঁর মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে দেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন ঃ সব বীর্য মূলত মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্য দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারও কারও মতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজনে মাটি অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাই প্রত্যেক মানুষের সৃজনকে প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ কোরআনের ভাষা থেকে বাহ্যত একথাই বোঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃজিত হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত এক হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মাতৃগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি শামিল করা হয়, যেখানে আল্লাহ্র জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবু নাঈম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তারকেরায় উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

هذا حديث غريب من حديث عون لم نكتبه الا من حديث عاصم بن نبيل وهو احد الثقات الاعلام من اهل الصدق -

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী বলেন ঃ যখন মাতৃগর্ভে বীর্য স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্যের মধ্যে শামিল করে দেয়া হয়। কাজেই

মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্য উভয় বস্তু দ্বারাই হয়। আতা এই বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন ঃ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ (কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক শিশুর নাভিতে মাটির অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খমিরে শামিল করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন ঃ আমি, আবু বকর ও উমর একই মাটি থেকে সৃজিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হব। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন ঃ হাদীসটি গরীব। ইবনে জওযী একে মওযূআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়খ মুহাদ্দিস মির্যা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (রহ) বলেন ঃ এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে উমর, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান (লিগায়রিহি-র) চাইতে কম নয়। (মাযহারী)

مَكَانًا سُوًى---ফিরাউন মূসা (আ) ও যাদুকরদের মোকাবিলার জন্য নিজেই প্রস্তাব করল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফিরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী-ইসরাঈলের লোকদের সমান দূরত্বে অবস্থিত---যাতে কোন পক্ষকেই বেশী দূরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। মূসা (আ) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ---অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতা সাজসজ্জার দিনে হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য---ঈদ অথবা কোন মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন্ দিন ছিল, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন ঃ ফিরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজসজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হত। কেউ কেউ বলেন ঃ এটা ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন ঃ এটা শনিবার ছিল যাকে তারা সম্মান করত। আবার কারও মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহাররম মাসের দশম দিবস ছিল।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত মূসা (আ) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণীর লোকের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ ওপরে ওঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই

উত্তম। এরূপ সময়েই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়। এরূপ সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ফিরাউনী যাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দূর-দূরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে।

যাদুর স্বরূপ, প্রকার ও শরীয়তগত বিধি-বিধান ঃ এই বিষয়বস্তু বিস্তারিত বর্ণনা-সহ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআন প্রথম খণ্ডের সূরা বাক্বারায় হারূত ও মারূতের কাহিনীতে উল্লেখিত হয়েছে। অতএব সেখানে দেখে নেয়া উচিত।

فَتَوَلّٰى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهٗ ثُمَّ اَتٰى ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى وَيْلَكُمْ
لَا تَفْتَرُوْا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ
افْتَرٰى ﴿٦١﴾ فَتَنَازَعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى ﴿٦٢﴾ قَالُوْٓا
اِنْ هٰذٰنِ لَسٰحِرٰنِ يُرِيْدٰنِ اَنْ يُّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا
وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى ﴿٦٣﴾ فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوْا
صَفًّا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلٰى ﴿٦٤﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِمَّآ اَنْ
تُلْقِيَ وَاِمَّآ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا
حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾
فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ
الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ۭ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ
سٰحِرٍ ۭ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾ فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْٓا اٰمَنَّا
بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَمُوْسٰى ﴿٧٠﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۭ اِنَّهٗ
لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ
خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۡ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَآ اَشَدُّ عَذَابًا

وَّاَبْقٰى ﴿٧١﴾ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِىْ
فَطَرَنَا فَاقْضِ مَآ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾
اِنَّآ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَمَآ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ
وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿٧٣﴾ اِنَّهٗ مَنْ يَّاْتِ رَبَّهٗ مُجْرِمًا فَاِنَّ لَهٗ
جَهَنَّمَ ؕ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿٧٤﴾ وَمَنْ يَّاْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ
الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ﴿٧٥﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ﴿٧٦﴾

(৬০) অতঃপর ফিরাউন প্রস্থান করল এবং তার সব কলাকৌশল জমা করল, অতঃপর উপস্থিত হল। (৬১) মূসা (আ) তাদেরকে বললেনঃ দুর্ভাগ্য তোমাদের; তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে-ই বিফলমনোরথ হয়েছে। (৬২) অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (৬৩) তারা বললঃ এই দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর, তারা তাদের যাদুর দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-ব্যবস্থা রহিত করতে চায়। (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম হবে। (৬৫) তারা বললঃ হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি। (৬৬) মূসা বললেনঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তার মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। (৬৭) অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। (৬৮) আমি বললামঃ ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। (৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না। (৭০) অতঃপর যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। তারা বললঃ আমরা হারূন ও মূসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (৭১) ফিরাউন বললঃ আমার অনুমতি দানের পূর্বেই? তোমরা কি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে দেখছি সেই তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শূলে চড়াব এবং তোমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার

আযাব কঠোরতর এবং অধিকক্ষণ স্থায়ী। (৭২) যাদুকররা বলল ঃ আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার ওপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার ওপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে। (৭৩) আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি---যাতে তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। (৭৪) নিশ্চয় যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। (৭৫) আর যারা তার কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে সুউচ্চ মর্তবা। (৭৬) বসবাসের এমন পুষ্পোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (একথা শুনে) ফিরাউন (দরবার থেকে স্বস্থানে) প্রস্থান করল এবং তার কলাকৌশলের (অর্থাৎ যাদুর) উপকরণাদি জমা করতে লাগল ও (সবাইকে নিয়ে নির্ধারিত ময়দানে) উপস্থিত হল। (তখন) মূসা (আ) তাদেরকে (অর্থাৎ উপস্থিত যাদুকরদেরকে) বললেন ঃ ওহে হতভাগারা, আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলো না (অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব অথবা একত্ববাদ অস্বীকার করো না কিংবা তাঁর প্রকাশকৃত মু'জিযাসমূহকে যাদু বলে দিও না।) তাহলে তিনি তোমাদেরকে কোন প্রকার আযাব দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে (পরিণামে) বিফল মনোরথ হয়। অতঃপর যাদুকররা (একথা শুনে তাঁদের উভয়ের সম্পর্কে) পরস্পর বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (অবশেষে সবাই একমত হয়ে) বলল ঃ নিশ্চিতই তারা দুইজন যাদুকর। তাদের মতলব এই যে, তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবে এবং তোমাদের উত্তম (ধর্মীয়) জীবন-ব্যবস্থাও রহিত করে দেবে। অতএব তোমরা সম্মিলিতভাবে নিজেদের কলাকৌশল সুসংহত কর এবং সারিবদ্ধ হয়ে (মোকাবিলায়) আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম। (অতঃপর) তারা মূসা (আ)-কে বলল ঃ হে মূসা, (বল) তুমি (তোমার লাঠি) প্রথমে নিক্ষেপ করবে, না আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করব? মূসা (অত্যন্ত বেপরওয়া হয়ে) বললেন ঃ না, প্রথমে তোমরাই নিক্ষেপ কর। (সেমতে তারা তাদের দড়ি ও লাঠিসমূহ নিক্ষেপ করল এবং নজরবন্দী করে দিল)। হঠাৎ তাদের দড়ি ও লাঠিসমূহ নজরবন্দীর কারণে মূসা (আ)-র কল্পনায় এমন মনে হল, যেন (সেগুলো সাপের মত) ছুটোছুটি করছে। অতঃপর মূসা (আ) মনে মনে কিছুটা ভীত হলেন। [তিনি আশংকা করলেন যে, এসব দড়ি ও লাঠিও যখন দৃশ্যত সাপ হয়ে গেছে এবং আমার লাঠি নিক্ষেপ করলে তা-ও বড়জোর সাপ হয়ে যাবে, তখন দর্শকরা তো উভয় বস্তুকেই একই মনে করবে। এতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য কিভাবে হবে? এই ভীতি স্বভাবের

তাগিদে ছিল। নতুবা মূসা (আ) পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন নির্দেশ দিয়েছেন তখন এর যাবতীয় উত্থান-পতনের ব্যবস্থাও তিনিই করবেন এবং তাঁর রসূলের প্রতি পর্যাপ্ত সাহায্য করবেন। মানসিক কল্পনার স্তরে অবস্থিত এই স্বাভাবিক ভয় কামালিয়তের পরিপন্থী নয়। মোটকথা, এই ভয় দেখা দেওয়ায় তাঁকে] আমি বললাম ঃ ভয় করো না, তুমিই বিজয়ী হবে। (বিজয় এভাবে হবে যে) তোমার ডান হাতে যা আছে, তা তুমি নিক্ষেপ কর (অর্থাৎ লাঠি), তারা যা কিছু (অভিনয়) করেছে এটা (অর্থাৎ এই লাঠি) সেগুলো গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে, তা যাদুকরদের অভিনয় মাত্র। যাদুকর যেখানেই যাক, (মু'জিযার মুকাবিলায়) কামিয়াব হবে না। মূসা (আ) নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, এবার চমৎকার পার্থক্য হতে পারবে। সেমতে তিনি লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং তা বাস্তবিকই সবগুলোকে গ্রাস করে ফেলল। অতঃপর যাদুকররা (যাদুবিদ্যার আওতা বহির্ভূত এ-কাজটি দেখে বুঝে ফেলল যে, এটা নিঃসন্দেহে মু'জিযা। তৎক্ষণাৎ তারা সবাই) সিজদায় পড়ে গেল এবং (উচ্চৈঃস্বরে) বলল ঃ আমরা হারূন ও মূসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। ফিরাউন (এ ঘটনা দেখে) যাদুকরদেরকে শাসিয়ে বলল ঃ তোমরা কি আমার অনুমতিদানের পূর্বেই মূসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ? বাস্তবিকই (মনে হয়) সে (যাদুবিদ্যায়) তোমাদেরও প্রধান (ও উস্তাদ)। সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। (অতএব উস্তাদ ও শাগরিদরা চক্রান্ত করে রাজত্বলাভের আশায় যুদ্ধ করেছ।) সুতরাং (এখন স্বরূপ ধরা পড়বে।) আমি তোমাদের সবার একদিকের পা কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে খর্জুর-বৃক্ষে ঝুলিয়ে দেব (যাতে সবাই এ দৃশ্য দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে)। তোমরা একথাও জানতে পারবে যে, আমাদের উভয়ের মধ্যে (অর্থাৎ আমার মধ্যে ও মূসার পালনকর্তার মধ্যে) কার আযাব অধিকতর কঠোর ও অধিক স্থায়ী। তারা পরিষ্কার বলে দিল যে, আমরা তোমাকে কিছুতেই ঐ প্রমাণাদির মুকাবিলায় প্রাধান্য দেবো না, যা আমাদের কাছে এসেছে এবং ঐ সত্তার মুকাবিলায়ও যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তুমি যা খুশী (মন খুলে) করে ফেল। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে। আমরা তো আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি—যাতে তিনি আমাদের (বিগত) পাপ (কুফর ইত্যাদি) মার্জনা করেন এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছ, তাও (মার্জনা করেন)। আল্লাহ্ তা'আলা (সত্তা ও গুণাবলীর দিক দিয়েও তোমার চাইতে) শ্রেষ্ঠ এবং (সওয়াব ও শাস্তির দিক দিয়েও) চিরস্থায়ী। (আর তুমি না শ্রেষ্ঠ, না চিরস্থায়ী।) এমতাবস্থায় তোমার পুরস্কারই বা কি, যার ওয়াদা আমাদের সাথে করেছ এবং আযাবই বা কি, যার হুমকি আমাদেরকে দিচ্ছ। আল্লাহ্ তা'আলার চিরস্থায়ী সওয়াব ও আযাবের বিধি এই যে, যে ব্যক্তি (বিদ্রোহের) অপরাধী হয়ে (অর্থাৎ কাফির হয়ে) তার পালনকর্তার কাছে আসবে, তার জন্য জাহান্নাম (নির্ধারিত) আছে। সেখানে সে মরবেও না এবং বাঁচবেও না। (না মরার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয় এবং না বাঁচার অর্থ এই যে, বাঁচার সুখ পাবে না।) এবং যে ব্যক্তি তাঁর কাছে ঈমানদার হয়ে আসে, যে সৎ কাজও করে, এরূপ লোকদের জন্য খুব উচ্চ মর্যাদা আছে; অর্থাৎ চিরকাল বসবাসের উদ্যানসমূহ। এগুলোর তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে

চিরকাল থাকবে। যে ব্যক্তি (কুফর ও গোনাহ্ থেকে) পবিত্র হয়, এটাই তার পুরস্কার। (সুতরাং এই বিধি অনুযায়ী আমরা কুফর পরিত্যাগ করে ঈমান অবলম্বন করেছি।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَجَمَعَ كَيْدَهُ ---ফিরাউন মূসা (আ)-র মুকাবিলার কৌশল হিসাবে যাদুকর ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে নিল। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে যাদুকরদের সংখ্যা বাহাত্তর বর্ণিত আছে। সংখ্যা সম্পর্কে অন্যান্য আরও বিভিন্ন উক্তি আছে। চারশ থেকে নয় লাখ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবাই শামউন নামক জনৈক সরদারের নির্দেশমত কাজ করত। কথিত আছে যে, তাদের সরদার একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিল। ---(কুরতুবী)

যাদুকরদের প্রতি মূসা (আ)-র পয়গম্বরসুলভ ভাষণ ঃ মু'জিযা দ্বারা যাদুর মুকাবিলা করার পূর্বে মূসা (আ) যাদুকরদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহ্র আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। বাক্যগুলো এই ঃ

وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى

অর্থাৎ তোমাদের ধ্বংস অত্যাসন্ন। আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করো না অর্থাৎ তাঁর সাথে ফিরাউন অথবা অন্য কাউকে শরীক করো না। এরূপ করলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আযাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়।

বলা বাহুল্য, ফিরাউনের শয়তানী শক্তি ও লোক-লস্করের সহায়তায় যারা মুকাবিলা করার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, এসব উপদেশমূলক বাক্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া তাদের জন্য সুদূরপরাহত ছিল। কিন্তু পয়গম্বর ও তাঁদের অনুসারীগণের সাথে সত্যের একটি গোপন শক্তি ও জাঁকজমক থাকে। তাদের সাদাসিধা ভাষাও পাষাণসম অন্তরে তীর ও ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। মূসা (আ)-র এসব বাক্য শ্রবণ করে যাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কারণ এ জাতীয় কথাবার্তা কোন যাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ বললেন ঃ এদের মুকাবিলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ--- এর অর্থ তাই। এরপর এই মতভেদ দূর করার জন্য তারা গোপনে পরামর্শ করতে লাগল وَأَسَرُّوا النَّجْوٰى ---কিন্তু অবশেষে মুকাবিলার পক্ষেই সমষ্টির মত প্রকাশ পেল। তারা বলল ঃ

إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ

অর্থাৎ তারা উভয়ে যাদুকর। তারা চায় তাদের যাদুর জোরে তোমাদেরকে অর্থাৎ ফিরাউন ও ফিরাউন বংশীয়দেরকে তোমাদের দেশ মিসর থেকে বহিষ্কার করে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ অধিকার করতে চায় এবং তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চায়। مُثْلَى শব্দটি أَمْثَل -এর স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যে ফিরাউনকে আল্লাহ্ ও ক্ষমতাশালী মান্য কর যে—এ ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম; এরা এই ধর্মকে রহিত করে তদস্থলে নিজেদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোন কওমের সরদার ও প্রতিনিধিদেরকেও 'কওমের তরিকা' বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রা) থেকে তরিকার এই তফসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা তোমাদের কওমের সরদার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মুকাবিলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব যাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হও। فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا —সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। তাই যাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মুকাবিলা করল।

যাদুকররা তাদের দ্রাক্ষেপহীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমে মূসা (আ)-কে বলল ঃ প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করব? মূসা (আ) জওয়াবে বললেন ঃ بَلْ أَلْقُوا —অর্থাৎ প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং যাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। মূসা (আ)-র এই জওয়াবে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল। প্রথমত মজলিসী শিষ্টাচারের কারণে এরূপ জওয়াব দিয়েছেন। যাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সৎসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর ভদ্রজনোচিত জওয়াব ছিল এই যে, মূসা (আ)-র পক্ষ থেকে আরও অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেওয়া। দ্বিতীয়ত যাদুকররা তাদের স্থিরচিত্ততা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। মূসা (আ) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়ত যাতে মূসা (আ)-র সামনে তাদের যাদুর সব লীলাখেলা এসে যায়, এরপরই

তিনি তাঁর মু'জিযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মত ফুটে উঠতে পারত। যাদুকররা মূসা (আ)-র কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যত সাপ হয়ে ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগল।

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ—এ থেকে জানা যায় যে, ফিরাউনী যাদুকরদের যাদু ছিল একপ্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ যাদু এরূপই হয়ে থাকে।

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ—অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে মূসা (আ)-র মধ্যে ভয় সঞ্চার হল; কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন—প্রকাশ হতে দেন নি। এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয় হয়ে থাকে, তবে মানবতার খাতিরে এরূপ হওয়া নবুয়তের পরিপন্থী নয়। কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশংকা করছিলেন যে, এই বিরাট সমাবেশের সামনে যদি যাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জওয়াবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হয়েছেঃ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ এতে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে, যাদুকররা জিততে পারবে না। তুমিই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবে। এভাবে মূসা (আ)-র উপরোক্ত আশংকা দূর করে দেওয়া হয়েছে।

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ—মূসা (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ কর। এখানে মূসা (আ)-র লাঠি বোঝানো হয়েছে; কিন্তু তা পরিষ্কার উল্লেখ না করে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের যাদুর কোন মূল্য নেই। এজন্য পরোয়া করো না এবং তোমার হাতে যা-ই আছে, তাই নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হল। মূসা (আ) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা একটি বিরাট অজগর সাপ হয়ে যাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

যাদুকররা মুসলমান হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লঃ মূসা (আ)-র লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাল্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন যাদুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ যাদুকরদের বুঝতে বাকী রইল না যে, এ-কাজ যাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মু'জিযা, যা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সিজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করলঃ আমরা মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, যাদুকররা ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা থেকে মাথা তোলেনি, যতক্ষণ আল্লাহ্‌র কুদরত তাদেরকে জান্নাত ও দোযখ প্রত্যক্ষ না করিয়ে দেয়।—(রূহুল মা'আনী)

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ—আল্লাহ্ তা আলা যখন এই বিরাট সমাবেশের সামনে ফিরাউনের লাঞ্ছনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে যাদুকরদেরকে বলতে লাগল ঃ আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরূপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই যাদুকরদের কোন কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মু'জিযা দেখার পর কারও অনুমতির আবশ্যকতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন যাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল ঃ এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মূসার শিষ্য। এই যাদুকরই তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছ।

فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ—এখন ফিরাউন যাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবত ফিরাউনী আইনে শাস্তির এই পন্থাই প্রচলিত ছিল অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিক্ষার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফিরাউন এ পন্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে। وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِيْ جُذُوْعِ النَّخْلِ—অর্থাৎ হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের শূলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা ঝুলে থাকবে।

قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا—যাদুকররা ফিরাউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হল না। তারা বলল ঃ আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোন কথাকে ঐসব নিদর্শন ও মু'জিযার ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো মূসা (আ)-র মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। হযরত ইকরামা বলেন ঃ যাদুকররা যখন সিজদায় গেল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের উচ্চ স্তর ও নিয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। তাই তারা বলল ঃ এসব নিদর্শন সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না।—(কুরতুবী) এবং জগৎ-স্রষ্টা আসমান-যমীনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না। فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ—এখন তোমার যা খুশী, আমাদের সম্পর্কে ফয়সালা কর এবং যে সাজা দেবার ইচ্ছা, দাও। اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا—অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা

এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের ওপর তোমার কোন অধিকার থাকবে না। আল্লাহ্‌র অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তাঁর অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরেও থাকব। কাজেই তাঁর শাস্তির চিন্তা অগ্রগণ্য।

وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ----যাদুকররা এখন ফিরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে যাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অনর্থক কাজের কাছে যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্‌র কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, যাদুকররা স্বেচ্ছায় মুকাবিলা করতে এসেছিল এবং এই মুকাবিলার জন্য দর কষাকষিও ফিরাউনের সাথে করেছিল অর্থাৎ বিজয়ী হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফিরাউনের বিরুদ্ধে যাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরূপে শুদ্ধ হবে? এর এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, যাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মু'জিযার মুকাবিলা করতে পারবে না। তখন ফিরাউন তাদেরকে মুকাবিলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও বর্ণনা করা হয় যে, ফিরাউন তার রাজ্যে যাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই যাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। ---(রূহুল মা'আনী)

ফিরাউন-পত্নী আছিয়ার শুভ পরিণতি ঃ তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সংঘর্ষের সময় ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া মুকাবিলার শুভ ফলাফলের জন্য সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে মূসা ও হারূন (আ)-এর বিজয়ের সংবাদ শোনানো হল, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেন ঃ আমিও মূসা ও হারূনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ পত্নীর সংবাদ শুনে ফিরাউন আদেশ দিল ঃ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তার মাথার ওপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তাঁর প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তাঁর মৃতদেহের ওপর পাথর পতিত হল।

ফিরাউনী যাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঃ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا থেকে ذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ----এসব বাক্যও প্রকৃত সত্য যা খাঁটি ইসলামী বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ঐ যাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তারা ইসলামী বিশ্বাস ও কর্মের কোন শিক্ষাও পায়নি। এসব হযরত মূসা (আ)-র সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সামনে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেনি এবং কঠোরতর শাস্তি ও বিপদের

ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তারা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে ওলীত্বের ঐ স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হয়ে থাকে। فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও উবায়দ ইবনে উমায়র বলেন ঃ আল্লাহ্র কুদরতের লীলা দেখ, তারা দিনের প্রারম্ভে কাফির যাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহ্র ওলী ও শহীদ হয়ে গেল।---(ইবনে কাসীর)

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى ۙ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ
طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا ۙ لَّا تَخٰفُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى ۝٧٧ فَاَتْبَعَهُمْ
فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝٧٨ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ
قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى ۝٧٩ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَ
وٰعَدْنٰكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْاَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۝٨٠
كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ
غَضَبِىْ ۚ وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى ۝٨١ وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ
لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى ۝٨٢

(৭৭) আমি মূসার প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্য সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশংকা করো না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয়ও করো না। (৭৮) অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। (৭৯) ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছিল এবং সৎপথ দেখায়নি। (৮০) হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি এবং তোমাদের কাছে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছি। (৮১) বলেছি ঃ আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালংঘন করো না, তা হলে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধ্বংস হয়ে যায়। (৮২) আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (যখন ফিরাউন এরপরও বিশ্বাস স্থাপন করল না এবং কিছুকাল পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাপার ও ঘটনা ঘটল, তখন) আমি মূসা (আ)-র কাছে ওহী নাযিল করলাম যে, আমার (এই) বান্দাদেরকে (অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে মিসর থেকে) রাত্রিযোগে (বাইরে) নিয়ে যাও (এবং দূরে চলে যাও---যাতে ফিরাউনের অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে তারা মুক্তি পায়)। অতঃপর (পথিমধ্যে যে সমুদ্র পড়বে) তাদের জন্য সমুদ্রে (লাঠি মেরে) শুষ্ক পথ নির্মাণ কর (অর্থাৎ লাঠি মারতেই শুষ্ক পথ হয়ে যাবে)। পেছন থেকে এসে ধরে ফেলার আশংকা করো না (কেননা, পশ্চাদ্ধাবন করলেও পশ্চাদ্ধাবনকারীরা সফল হবে না।) এবং অন্য কোন প্রকার (উদাহরণত ডুবে যাওয়ার) ভয়ও করো না। [বরং নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে পার হয়ে যাবে। নির্দেশ অনুযায়ী মূসা (আ) তাদেরকে রাত্রিযোগে বের করে নিয়ে গেলেন। সকালে মিসরে খবর ছড়িয়ে পড়ল।] অতঃপর ফিরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। (এদিকে আল্লাহ্‌র ওয়াদা অনুযায়ী বনী-ইসরাঈল সমুদ্র পার হয়ে গেল। সামুদ্রিক পথগুলো তখনও তদবস্থায়ই ছিল, যেমন অন্য এক আয়াতে আছে وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ফিরাউনীরা ব্যস্ততার মধ্যে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে এসব পথে নেমে পড়ল। যখন সবাই মাঝখানে এসে গেল) তখন (চতুর্দিক থেকে) সমুদ্র (অর্থাৎ সমুদ্রের পানি জমা হয়ে) তাদেরকে যেভাবে ঢেকে নেওয়ার ছিল, ঢেকে নিল (এবং সবাই সলিলসমাধি লাভ করল)। ফিরাউন তার সম্প্রদায়কে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেছে এবং সৎ পথ দেখায়নি (যা সে দাবি করত وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ---ভ্রান্তপথ এজন্য যে, ইহকালেরও ক্ষতি হয়েছে অর্থাৎ সবাই ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও ক্ষতি হয়েছে। কেননা, তারা জাহান্নামী হয়েছ ; যেমন আয়াতে আছে أُدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া থেকে উদ্ধারের পর বনী ইসরাঈলকে আরও অনেক নিয়ামত দান করা হয় ; উদাহরণত তওরাত এবং মান্না ও সালওয়া দান করা। এসব নিয়ামত দিয়ে আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম ঃ) হে বনী ইসরাঈল, (দেখ,) আমি (কি কি নিয়ামত দিয়েছি) তোমাদেরকে তোমাদের (এত বড়) শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি এবং তোমাদের কাছে (অর্থাৎ তোমাদের পয়গম্বরের কাছে তোমাদের উপকারার্থে) তূর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে আসার (অর্থাৎ যেখানে আসার পর তওরাত দানের) ওয়াদা করেছি এবং (তীহ্ উপত্যকায়) আমি তোমাদের কাছে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল করেছি (এবং অনুমতি দিয়েছি যে) আমার দেওয়া উত্তম (হালাল হওয়ার কারণে শরীয়তদৃষ্টে উত্তম এবং সুস্বাদু হওয়ার কারণে স্বভাবগতভাবেও উত্তম) বস্তুসমূহ খাও এবং এতে (অর্থাৎ খাওয়ার মধ্যে) সীমালংঘন করো না। [উদাহরণত

অবৈধভাবে উপার্জন করো না (দুরর) অথবা খেয়ে গোনাহে লিপ্ত হয়ো না।] তাহলে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে। যার ওপর আমার ক্রোধ নেমে আসে, সে সম্পূর্ণ নেস্তনাবুদ হয়ে যায়। (পক্ষান্তরে এটাও স্মর্তব্য যে) যে (কুফর ও গোনাহ্ থেকে) তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, অতঃপর (এ পথে) কায়েম (ও) থাকে (অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্ম অব্যাহত রাখে) আমি এরূপ লোকদের জন্য অত্যন্ত ক্ষমাশীলও। (আমি এই বিষয়বস্তু বনী ইসরাঈলকে বলেছিলাম। কেননা, নিয়ামত স্মরণ করানো, কৃতজ্ঞতার আদেশ, গোনাহে নিষেধ, পুরস্কারের ওয়াদা এবং শাস্তির ভয় প্রদর্শনও ধর্মীয় নিয়ামত বিশেষ।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ—যখন সত্য ও মিথ্যা, মু'জিযা ও যাদুর চূড়ান্ত লড়াই ফিরাউন ও ফিরাউন বংশীয়দের কোমর ভেঙ্গে দিল এবং মূসা ও হারূন (আ)-এর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল, তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হল। কিন্তু ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পথিমধ্যে সমুদ্র অন্তরায় হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিল। তাই মূসা (আ)-কে এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যে বলা হল যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদ্দিক থেকে ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবনের আশংকা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই 'হাদীসুল-ফুতূনে' উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসা (আ) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্তূপ জমাট বরফের ন্যায় পাহাড়সম দণ্ডায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ দৃষ্টিগোচর হল। সূরা শুআরায় বলা হয়েছে ঃ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ বারটি সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং কথাবার্তাও বলত। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দুশ্চিন্তা দূর করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছিল।----(কুরতুবী)

মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বনী ইসরাঈলের কিছু অবস্থা ঃ তাদের সংখ্যা ও ফিরাউনী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ঃ তফসীরে রূহুল মাআনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মূসা (আ) রাত্রির সূচনাভাগে বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী ইসরাঈল ইতিপূর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্য বাইরে যাবে। এই বাহানায় তারা ঈদের পরে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকারপত্র ধার করে নেয়। বনী ইসরাঈলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়ায়েতে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো

ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কোরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও আল্লাহ্‌র কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর আমলে বনী ইসরাঈল যখন মিসরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের বার গোত্রের এত বিপুলসংখ্যক লোক মিসর থেকে বের হল যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফিরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্র করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের ঘোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভূমধ্যসাগর দেখে বনী ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং মূসা (আ)-কে বলল ঃ

إِنَّا لَمُدْرَكُونَ—অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মূসা (আ) সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ—আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং তাতে বারটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফিরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পেঁৗছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরী হয়ে গেল! কিন্তু ফিরাউন সগর্বে সৈন্যদেরকে বলল ঃ এগুলো সব আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে গেছে। একথা বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের ঘোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাতে আসার আদেশ দিল। যখন ফিরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামুদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তীরে রইল না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে গেল। فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ বাক্যের সারমর্ম তাই।—(রূহুল-মা'আনী)

وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ—ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় বনী ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে মূসা (আ)-কে তওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী ইসরাঈল স্বয়ং তাঁর বাক্যালাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ—এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্রসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেওয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে

তীহ্ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্ত্বেও মূসা (আ)-র বরকতে তাদের ওপর বন্দীদশায়ও নানা রকম নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। 'মান্না' ও 'সালওয়া' ছিল এসব নিয়ামতেরই অন্যতম, যা তাদের আহারের জন্য দেওয়া হত।

وَمَآ اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوْسٰى ﴿٨٣﴾ قَالَ هُمْ اُولَآءِ عَلٰٓى اَثَرِىْ وَ
عَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى ﴿٨٤﴾ قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ
بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِىُّ ﴿٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوْسٰٓى اِلٰى قَوْمِهٖ
غَضْبَانَ اَسِفًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ۚ
اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ اَنْ يَّحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ
مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ ﴿٨٦﴾ قَالُوْا مَآ اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا
وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَآ اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنٰهَا فَكَذٰلِكَ
اَلْقَى السَّامِرِىُّ ﴿٨٧﴾ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا
هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى ۙ فَنَسِىَ ﴿٨٨﴾ اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ
اِلَيْهِمْ قَوْلًا ۙ وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا ﴿٨٩﴾

(৮৩) হে মূসা, তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুমি ত্বরা করলে কেন? (৮৪) তিনি বললেনঃ এই তো তারা আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার পালনকর্তা, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। (৮৫) বললেনঃ আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (৮৬) অতঃপর মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। তিনি বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের ওপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে? (৮৭) তারা বলল ঃ আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; কিন্তু আমাদের ওপর ফিরাউনীদের অলং--

কারের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি। এমনি-ভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। (৮৮) অতঃপর সে তাদের জন্য তৈরি করে বের করল একটা গো-বৎস---একটা দেহ, যার মধ্যে গরুর শব্দ ছিল। তারা বলল ঃ এটা তোমাদের উপাস্য এবং মূসারও উপাস্য, অতঃপর মূসা ভুলে গেছে। (৮৯) তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না ?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[আল্লাহ্ তা'আলা যখন তওরাত দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন মূসা (আ)-কে তূর পর্বতে আসার আদেশ দিলেন এবং সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যককেও সাথে আনার আদেশ দিলেন। ---(ফতহুল-মান্নান) মূসা (আ) আগ্রহের আতিশয্যে সবার আগে একা চলে গেলেন এবং অন্যরা স্বস্থানে রয়ে গেল ; তূর পর্বতে যাওয়ার ইচ্ছাই করল না। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ] হে মূসা, তোমার সম্প্রদায়ের পূর্বে তোমার দ্রুত আসার কারণ কি সংঘটিত হল ? তিনি (নিজ ধারণা অনুযায়ী) বললেন ঃ এই তো তারা আমার পেছনে আসছে। আমি (সবার আগে) আপনার কাছে (অর্থাৎ যেখানে আপনি বাক্যালাপের ওয়াদা করেছেন) তাড়াতাড়ি এসে গেছি, যাতে আপনি (অধিক) সন্তুষ্ট হন। (কেননা, আদেশ পালনে ত্বরা করা অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে।) তিনি বললেন ঃ তোমার সম্প্রদায়কে তো আমি তোমার (চলে আসার) পর এক পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তাদেরকে সামেরী পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে (فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا ---বলে এ কথা পরে বর্ণনা করা হয়েছে। فَتَنَّا বলে আল্লাহ্ তা'আলা এ কাজটিকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। কারণ, প্রত্যেক কাজের স্রষ্টা তিনিই। নতুবা এ কাজটি আসলে সামেরীর, যা اَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে।) মোটকথা, মূসা (আ) (মেয়াদ শেষ হওয়ার পর) ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম (ও সত্য) ওয়াদা দেননি (যে, আমি তোমাদেরকে একটি বিধি-বিধানের গ্রন্থ দেব, এই গ্রন্থের জন্য তোমাদের অপেক্ষা করা জরুরী ছিল) তবে কি তোমাদের ওপর দিয়ে (নির্দিষ্ট মেয়াদের চাইতে অনেক) বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল (যে, তা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছ, তাই নিজেরাই একটি ইবাদত উদ্ভাবন করে নিয়েছ)? না (নিরাশ না হওয়া সত্ত্বেও) তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের ওপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, এ জন্য তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা [অর্থাৎ আপনার ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা কোন নতুন কাজ করব না এবং আপনার প্রতিনিধি হারূন (আ)-এর আনুগত্য করব] ভঙ্গ করলে ? তারা বলল ঃ আমরা আপনার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি ; (এর অর্থ এরূপ নয় যে, কেউ জোর-জবরে তাদের দ্বারা একাজ করিয়ে নিয়েছে ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমরা

মুক্ত মনে প্রথমে যে অভিমত অবলম্বন করেছিলাম, তার বিপরীতে সামেরীর কাজ আমাদের জন্য সন্দেহের কারণ হয়ে গেছে। ফলে আমরা পূর্ববর্তী অভিমত অর্থাৎ তওহীদ অবলম্বন করিনি; বরং অভিমত বদলে গেছে; যদিও আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছি। সেমতে পরে বলা হচ্ছে) কিন্তু আমাদের ওপর (কিবতী) সম্প্রদায়ের অলঙ্কারের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা (সামেরীর কথায় অগ্নিকুণ্ডে) নিক্ষেপ করে দিয়েছি। এরপর সামেরীও এমনিভাবে (তার অলঙ্কার) নিক্ষেপ করেছে। (অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা কাহিনীর এভাবে উপসংহার টেনেছেন,) অতঃপর সে (সামেরী) তাদের জন্য তৈরি করে বের করে আনল একটি গো-বৎস—একটি অবয়ব (গুণাবলী থেকে মুক্ত), যাতে একটি (অর্থহীন) শব্দ ছিল। (এর সম্পর্কে বোকা) লোকেরা বলল ঃ এটা তোমাদের এবং মূসারও মাবুদ (এর ইবাদত কর) মূসা তো ভুলে গেছে (ফলে আল্লাহ্র তালাশে তূর পর্বতে চলে গেছে। আল্লাহ্ তাদের এই বোকামি প্রসূত ধৃষ্টতার জওয়াবে বলেন ঃ তারা কি দেখে না যে, এটা (পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে) তাদের কোন কথার উত্তর দিতে পারে না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না! (এমন অকর্মন্য বস্তু খোদা হবে কিরূপে? সত্য মাবুদ পয়গম্বরদের মাধ্যমে বাক্যালাপ অবশ্যই-করেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

যখন মূসা (আ)-ও বনী ইসরাঈল ফিরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্রসর হল, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজাপাঠ দেখে বনী ইসরাঈল বলতে লাগল ঃ তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে আল্লাহ্ বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যও এমনি ধরনের কোন আল্লাহ্ বানিয়ে দাও। মূসা (আ) তাদের বোকামিসুলভ দাবির জওয়াবে বললেন ঃ তোমরা তো নেহাতই মূর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল।

إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তূর পর্বতে চলে এস। আমি তোমাকে তওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তওরাতলাভ করার পূর্বে তোমাকে ত্রিশদিন ও ত্রিশরাত অবিরাম রোযা রাখতে হবে। এরপর দশ দিন আরও বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেওয়া হল। মূসা (আ) বনী ইসরাঈলসহ তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলার এই ওয়াদা দৃষ্টে মূসা (আ)-র আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌঁছে ত্রিশ দিবা-রাত্রির রোযা

রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হারূন (আ)-এর আদেশ মেনে চলবে। বনী ইসরাঈল হারূন (আ)-এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং মূসা (আ) দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, তারাও অনতিবিলম্বে তূর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পথিমধ্যে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং মূসা (আ)-র পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

মূসা (আ) তূর পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ—হে মূসা, তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দ্রুত কেন চলে এলে।

ত্বরা করা সম্পর্কে মূসা (আ)-কে প্রশ্ন ও তার রহস্য ঃ মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তূর পর্বতের নিকট পৌঁছে গেছে। তাঁর এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাঈল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেওয়াই ছিল উপরোক্ত প্রশ্নের বাহ্যত উদ্দেশ্য। (ইবনে-কাসীর) রুহুল মা'আনীতে কাশশাফের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে ঃ এই প্রশ্নের কারণ ছিল মূসা (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া এবং এই ত্বরা করার জন্য হুঁশিয়ার করা যে, নবুয়তের পদের তাকিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সঙ্গে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্বরা করার ফল-শ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের মধ্যে এই ত্রুটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। 'ইনতিসাফ' গ্রন্থের বরাত দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, এতে মূসা (আ)-কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত; যেমন লূত (আ)-এর ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মু'মিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্রে রেখে তুমি সবার পশ্চাতে থাক। وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ

আল্লাহ্ তা'আলার উল্লিখিত প্রশ্নের জওয়াবে মূসা (আ) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয করলেন ঃ আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি; কারণ, নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বনী ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত গো-বৎস পূজার সংবাদ দেন এবং বলে দেন যে, সামেরীর পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ফিতনায় পতিত হয়েছে।

সামেরী কে ছিল ? ঃ কেউ কেউ বলেন ঃ সামেরী ফিরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে মূসা (আ)-র প্রতিবেশী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন সে-ও সাথে রওয়ানা হয়। কারও

কারও মতে সে বনী ইসরাঈলেরই সামেরা গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেনঃ এই পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ সে গো-বৎস পূজাকারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনরূপে মিসরে পৌঁছে সে বনী ইসরাঈলীদের ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা।—(কুরতুবী) কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছেঃ সে ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু ছিল এবং গো-পূজা করত। সে মূসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা প্রথম থেকেই কপট মনে ঈমান প্রকাশ করে।

জনশ্রুতি এইঃ সামেরীর নাম ছিল মূসা ইবনে যফর। ইবনে জারীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ফিরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল। ফিরাউনী সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্রহত্যার ভয়ে ভীতা জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে ওপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে শিশুর হিফাযত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তাঁর এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর এক অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হল ও বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করল। জনৈক কবি এই বিষয়বস্তুটিই এ ক'টি ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

اذا المرء لم يخلق سعيدا تحيرت
عقول مربيه وخاب المؤمل
فموسى الذى ربا جبريل كافر
وموسى الذى ربا فرعون مؤمن

কোন ব্যক্তি জন্মগতভাবে ভাগ্যবান না হলে তার লালন-পালনকারীদের বিবেকও হতভম্ব হয়ে যায় এবং তার প্রতি প্রত্যাশা পোষণকারী ব্যক্তিও নিরাশ হয়ে পড়ে। দেখ, যে মূসাকে জিবরাঈল লালন-পালন করেছেন, সে তো কাফির হয়ে গেল এবং যে মূসাকে অভিশপ্ত ফিরাউন লালন-পালন করেছে, সে আল্লাহ্র রসূল হয়ে গেল।

أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا—হযরত মূসা (আ) ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরে এসে জাতিকে সম্বোধন করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা স্মরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্য তিনি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওরাত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলা বাহুল্য, তওরাত লাভ করলে বনী ইসরাঈলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত।

أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ——অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার এই ওয়াদার পর তেমন কোন দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয় নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছ।

أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ——অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই; এখন এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গযব ডেকে আনছ।

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا——ملك শব্দটি মীমের যবর এবং মীমের পেশযোগে ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হই নি; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলা বাহুল্য, তাদের এই দাবি সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করে নি। বরং তারা নিজেরাই চিন্তাভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছে ঃ

وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ——وزر শব্দটি أوزار এর বহুবচন। অর্থ বোঝা। মানুষের পাপও কিয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে وزر এবং পাপরাশিকে أوزار বলা হয়। زينت শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কওম বলে ফিরাউনের কওমকে বোঝানো হয়েছে। বনী ইসরাঈল ঈদের বাহানায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে أوزار তথা পাপের বোঝা বলার কারণ এই যে, ধারের কথা বলে গৃহীত এসব অলংকার ফেরৎ দেওয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরৎ দেওয়া হয় নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা হয়েছে। 'হাদীসুল ফুতূন' নামে যে বিস্তারিত হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, হযরত হারূন (আ) তাদেরকে এগুলো যে পাপ, সে সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে সেগুলোকে একটি গর্তে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য তাদেরকে বলেছিল ঃ এসব অলংকার অপরের ধন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্য বিপদস্বরূপ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়।

কাফিরদের মাল মুসলমানদের জন্য কখন হালাল? ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব কাফির মুসলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাফিরের সাথে জান ও মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোন চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের

দের জন্য হালাল নয়; কিন্তু যেসব কাফির ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী নয় এবং যাদের সাথে কোন চুক্তিও হয়নি—ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় যাদেরকে 'কাফির হরবী' বলা হয়, তাদের মাল মুসলমানদের জন্য মূলতই হালাল। এমতাবস্থায় হারূন (আ) এই মালকে وزر তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জওয়াব বিশিষ্ট তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাফির হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্য হালাল; কিন্তু তা গনীমতের মালের (যুদ্ধলব্ধ মালের) মতই বিধান রাখে। ইসলামপূর্ব-কালে গনীমতের মাল সম্পর্কে এ আইন ছিল যে, তা কাফিরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েয ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্য তা ব্যবহার করা ও ভোগ করা জায়েয নয়। বরং গনীমতের মাল একত্র করে কোন টিলা ইত্যাদির ওপর রেখে দেওয়া হত এবং আসমানী আগুন (বজ্র ইত্যাদি) এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটাই ছিল তাদের জিহাদ কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে গনীমতের মালকে আসমানী আগুন গ্রাস করত না, সেই মাল জিহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হত। ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রসূলে করীম (সা)-এর শরীয়তে যেসব বিশেষ সুবিধা ও রেয়াত দেওয়া হয়েছে, তন্মধ্যে গনীমতের মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেওয়াও অন্যতম। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী ইসরাঈলের অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলোকে গনীমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্য সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। একারণেই এই মালকে اوزار (পাপরাশি) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হারূন (আ)-এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

জরুরী জ্ঞাতব্য ঃ কিন্তু ফিকাহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গিতে ইমাম মুহাম্মদ প্রণীত সিয়ার ও তার টীকা সুরখসী গ্রন্থে এ ব্যাপারে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক সত্যাশ্রয়ী। তা এই যে, কাফির হরবীর মালও সর্বাবস্থায় গনীমতের মাল হয় না; বরং যথারীতি জিহাদ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তরবারির জোরে এই মাল অর্জন করা শর্ত। একারণেই সুরখসী গ্রন্থে صفا لبه با لصحا ربه অর্থাৎ যুদ্ধের মাধ্যমে অধিকারভুক্ত করাকে শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কাফির হরবীর যে মাল যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় না, তা গনীমতের মাল নয়; বরং একে مال فيئى অর্থাৎ অনায়াসলব্ধ মাল বলা হয়। এরূপ মাল হালাল হওয়ার জন্য কাফিরদের সম্মতি ও অনুমতি শর্ত; যেমন কোন ইসলামী রাষ্ট্র কাফিরদের ওপর কর ধার্য করে দেয় এবং তারা তা দিতে সম্মত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যদিও কোন জিহাদ ও যুদ্ধ নেই; কিন্তু সম্মতিক্রমে প্রদত্ত এই মালও অনায়াসলব্ধ মালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হালাল।

এখানে কিবতীদের কাছ থেকে নেওয়া অলংকারপাতি যুদ্ধলব্ধ মাল নয়। কারণ এখানে কোন জিহাদ ও যুদ্ধ হয় নি এবং অনায়াসলব্ধ মালও নয়; কারণ এগুলো তাদের

কাছ থেকে ধারের কথা বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা এগুলো বনী ইসরাঈলের মালিকানায় দিতে সম্মত ছিল না। তাই ইসলামী শরীয়তের আইনেও এই মাল তাদের জন্য হালাল ছিল না।

রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করেন, তখন আরবের কাফিরদের অনেক আমানত তাঁর কাছে গচ্ছিত ছিল। কেননা সমগ্র আরব তাঁকে আমানতদাররূপে বিশ্বাস করত এবং তাঁকে 'আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে সম্বোধন করত। রসূলে করীম (সা) তাদের আমানত ফেরত দেওয়ার জন্য সযত্ন তৎপরতা প্রদর্শন করেন এবং সবগুলো আমানত হযরত আলী (রা)-র হাতে সোপর্দ করে আদেশ দেন যে, প্রত্যেকের আমানত ফেরতদানের কাজ সম্পন্ন করেই তুমি মদীনায় হিজরত করবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) এই মালকে গনীমতের মাল হিসেবে হালাল সাব্যস্ত করেন নি। এরূপ করলে তা মুসলমানদের মাল হয়ে যেত এবং ফেরতদানের প্রশ্নই উঠত না। والله اعلم

فَقَذَفْنَاهَا—অর্থাৎ আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। উল্লিখিত হাদীসুল ফুতুনের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারূন (আ)-এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণের সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়।

فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ—হাদীসে ফুতূনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হারূন (আ) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং মূসা (আ)-র ফিরে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বন্ধ করে সেখানে পেঁছিল এবং হারূন (আ)-কে জিজ্ঞেস করলঃ আমিও নিক্ষেপ করব? হারূন (আ) মনে করলেন যে, তার হাতেও কোন অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হারূন (আ)-কে বললঃ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক—আপনি আমার জন্য এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব—নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হারূন (আ)-এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলঙ্কারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি জিবরাঈল ফেরেশতার ঘোড়ার পায়ের নিচ থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ একদা সে এই বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে জিবরাঈলের ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটি দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরী করতে উদ্যত হল। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হারূন (আ)-এর দোয়ার বরকতে হোক—অলংকারাদির গলিত স্তূপ এই মাটি নিক্ষেপের এবং হারূন (আ)-এর দোয়া করার

সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বৎসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। যে রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী-ইসরাঈলকে অলঙ্কারাদি গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল, তাতে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, সে অলঙ্কারাদি গলিয়ে একটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরি করে নিয়েছিল কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। উপরোক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। (এসব রেওয়ায়েত কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বিধায় এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোন প্রমাণ নেই।

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ—অর্থাৎ সামেরী এসব অলঙ্কার দ্বারা একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরী করে নিল, তাতে গরুর আওয়াজ ছিল। جسد (অবয়ব) শব্দ দৃষ্টে কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, এটা অবয়ব ও দেহ ছিল—তাতে প্রাণ ছিল না। তবে বিশেষ এক কারণে তা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে প্রাণ ছিল।

فَقَالُوْا هٰذَآ اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰى فَنَسِيَ—অর্থাৎ আওয়াজরত গো-বৎস দেখে সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বলল ঃ এটাই তোমাদের এবং মূসার খোদা। কিন্তু মূসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ পর্যন্ত বনী-ইসরাঈলের অসার ওযর বর্ণিত হল। মূসা (আ)-র ক্রোধ দেখে তারা এই ওযর পেশ করেছিল। এরপর ঃ

اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا—বাক্যে তাদের নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি গো-বৎস জীবিত হয়ে গরুর মত আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই জ্ঞানপাপীদের একথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর সাথে আল্লাহ্‌র কি সম্পর্ক? যে ক্ষেত্রে গো-বৎসটি তাদের কথার কোন জওয়াব দিতে পারে না এবং তাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে তাকে আল্লাহ্ মেনে নেওয়ার নির্বুদ্ধিতার পেছনে কোন যুক্তি আছে কি?

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ
رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْٓا اَمْرِيْ ﴿٩٠﴾ قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ
عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى ﴿٩١﴾ قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ
ضَلُّوْٓا ﴿٩٢﴾ اَلَّا تَتَّبِعَنِ ۭ اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ

وَلَا بِرَأْسِيْ ۚ إِنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيْ إِسْرَآءِيْلَ
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِيْ ﴿٩٤﴾

(৯০) হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেনঃ হে আমার কওম, তোমরা তো এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়াময়। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (৯১) তারা বলল ঃ মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা সদাসর্বদা এর সাথেই সংযুক্ত হয়ে বসে থাকব। (৯২) মূসা বললেন ঃ হে হারূন, তুমি যখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল (৯৩) আমার পদাংক অনুসরণ করা থেকে? তবে তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করেছ? (৯৪) তিনি বললেন ঃ হে আমার জননীতনয়, আমার শ্মশ্রু ও মাথার চুল ধরে আকর্ষণ করো না; আমি আশংকা করলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা স্মরণে রাখ নি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদেরকে হারূন [(আ) মূসা (আ)-র ফিরে আসার] পূর্বেই বলেছিলেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা এর (অর্থাৎ গো-বৎসের) কারণে পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছ (অর্থাৎ এর পূজা কোনরূপেই দুরস্ত হতে পারে না। এটা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতা।) এবং তোমাদের (সত্যিকার) পালনকর্তা দয়াময় আল্লাহ্ (—এ গোবৎস নয়)। অতএব তোমরা (ধর্মের ব্যাপারে) আমার পথে চল এবং (এ সম্পর্কে) আমার আদেশ মেনে চল (অর্থাৎ আমার কথা ও কাজের অনুসরণ কর)। তারা উত্তর দিল ঃ আমরা তো যে পর্যন্ত মূসা (আ) ফিরে না আসেন, এরই (পূজার) সাথে সর্বদা অবিচল হয়ে বসে থাকব। [মোটকথা, তারা হারূন (আ)-এর উপদেশ কানে তুলল না। অবশেষে মূসা (আ) ফিরে এলেন এবং প্রথমে কওমকে সম্বোধন করলেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এরপর হারূন (আ)-কে সম্বোধন করে] বললেন ঃ হে হারূন, যখন তুমি দেখলে যে, তারা (সম্পূর্ণ) পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তখন আমার কাছে চলে আসতে তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল? (অর্থাৎ তখন আমার কাছে তোমার চলে আসা উচিত ছিল, যাতে তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করত যে, তুমি তাদের কাজকে অপছন্দ কর। এছাড়া এমন বিদ্রোহীদের সাথে যত বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করা যায়, ততই ভাল)। তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করেছ? (আমি বলেছিলাম যে, لَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ ! —নবম পারায় উল্লিখিত এ বাক্যের অর্থ এই যে, তুমি দুষ্কৃতিকারীদের অনুসরণ করো না। দুষ্কৃতিকারীদের সাথে সম্পর্ক না রাখা এবং পৃথক হয়ে যাওয়াও এর

ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত)। হারূন (আ) বললেনঃ হে আমার জননী-তনয় (অর্থাৎ আমার ভাই), তুমি আমার শ্মশ্রু এবং মাথার চুল ধরো না (এবং আমার ওযর শুনে নাও। তোমার কাছে চলে না আসার কারণ ছিল এই যে) আমি আশংকা করলাম যে, (আমি তোমার কাছে রওয়ানা হলে আমার সাথে তারাও রওয়ানা হবে, যারা গো-বৎস পূজায় শরীক হয় নি। ফলে বনী ইসরাঈল দুই-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। কারণ গো-বৎস পূজার নিন্দাকারীরা আমার সাথে থাকবে এবং অন্যরা এর পূজায়ই অবিচল হয়ে থাকবে। এমতাবস্থায়) তুমি বলবেঃ তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ (এটা কোন কোন ক্ষেত্রে সহ-অবস্থানের চাইতে অধিক ক্ষতিকর হয়। কেননা দুষ্কৃতিকারীরা খালি মাঠ পেয়ে নিঃসংকোচে দুষ্কৃতি বাড়িয়ে যেতে থাকে।) এবং তুমি (আমার) আদেশকে মর্যাদা দাও নি। (আমি তোমাকে সংস্কারের আদেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ এমতাবস্থায় তুমি আমাকে অভিযুক্ত করতে যে, আমি তো তোমাকে সংস্কারের আদেশ দিয়েছিলাম; কিন্তু তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে অনর্থ খাড়া করেছ)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজার ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে হারূন (আ) মূসা (আ)-র ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে অনেক হিতোপদেশ দিলেন; কিন্তু পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হারূন (আ)-এর অনুগত থেকে গো-বৎস পূজাকে ভ্রষ্টতা মনে করল। তাদের সংখ্যা বার হাজার বর্ণিত আছে।---(কুরতুবী) অবশিষ্ট দুই দল গো-বৎস পূজায় যোগ দিল। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, একদলে স্বীকার করল, মূসা (আ) ফিরে এসে নিষেধ করলে আমরা গো-বৎস পূজা ত্যাগ করব। অপর দলের অটল বিশ্বাস ছিল যে, মূসা (আ)ও ফিরে এসে গো-বৎসকেই উপাস্যরূপে গ্রহণ করবেন এবং আমরা যেভাবেই হোক এ পন্থা ত্যাগ করব না। উভয়দলের বক্তব্য শ্রবণ করে হারূন (আ) সমমনা বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন; কিন্তু বসবাসের স্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহ-অবস্থান অব্যাহত রইল।

মূসা (আ) ফিরে এসে প্রথমে বনী ইসরাঈলকে যা যা বললেন, তা পূর্ববর্তী আয়াত-সমূহে ব্যক্ত হয়েছে। এরপর তাঁর খলীফা হারূন (আ)-কে সম্বোধন করে তাঁর প্রতি তীব্র ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তাঁর শ্মশ্রু ও মাথার কেশ ধরে টান দিলেন এবং বললেনঃ তুমি যখন দেখলে যে, বনী ইসরাঈল প্রকাশ্যে গোমরাহী অর্থাৎ শিরক ও কুফরে লিপ্ত হয়ে পড়েছে, তখন আমার অনুসরণ করলে না কেন এবং আমার আদেশ অমান্য করলে কেন?

مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ---এখানে অনুসরণের এক অর্থ তো তাই, যা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ মূসা (আ)-র কাছে তূর পর্বতে চলে যাওয়া। কোন কোন তফসীরবিদ অনুসরণের এরূপ অর্থও করেছেন

যে, তারা যখন পথভ্রষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের মুকাবিলা করলে না কেন? কেননা আমার উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরূপ করা উচিত ছিল।

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হারূন (আ)-এর বিরুদ্ধে মূসা (আ)-র অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পথভ্রষ্টতায় হয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। তাদের সাথে সহ-অবস্থান মূসা (আ)-র মতে ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল। হারূন (আ) এই কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে মূসা (আ)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয়' বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শত্রু নই। তাই আমার ওযর শুনে নাও। অতঃপর হারূন (আ) এরূপ ওযর বর্ণনা করলেনঃ আমি আশংকা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় اخلفنى فى قومى واصلح বলে আমাকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। (কারণ এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তওহীদে ফিরে আসবে)। কোরআন পাকের অন্যত্র হারূন (আ)-এর ওযরের মধ্যে এ কথাও রয়েছেঃ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ অর্থাৎ বনী ইসরাঈল আমাকে শক্তিহীন ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা অন্যদের মুকাবিলায় আমার সঙ্গী-সাথী নগণ্য সংখ্যক ছিল। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

ওযরের সার-সংক্ষেপ এই যে, আমি তাদের পথভ্রষ্টতার সাথী ছিলাম না। যতটুকু উপদেশ দেওয়া আমার সাধ্যে ছিল, আমি তা পূর্ণ করেছি। কিন্তু তারা আমার আদেশ অমান্য করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় যদি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম অথবা তাদেরকে পরিত্যাগ করে তোমার কাছে চলে যেতাম, তবে মাত্র বার হাজার বনী ইসরাঈলই আমার সাথে থাকত; অবশিষ্টরা তখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হত এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ তুঙ্গে উঠত। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তোমার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করেছি। এই ওযর শুনে মূসা (আ) হারূন (আ)-কে ছেড়ে দিলেন এবং এ অনর্থের আসল উদ্গাতা সামেরীর খবর নিলেন। কোরআনের কোথাও একথা বলা হয়নি যে, মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-এর মতামতকে বিশুদ্ধ মেনে নেন অথবা নিছক ইজতিহাদী ভুল মনে করে ছেড়ে দেন।

পয়গম্বরদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্য এবং উভয় পক্ষে যথার্থতার দিকঃ এ ঘটনায় মূসা (আ)-র মত ইজতিহাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ছিল যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হারূন (আ) ও তাঁর সঙ্গীদের মুশরিক কওমের সাথে সহ-অবস্থান উচিত ছিল না। তাদেরকে

ছেড়ে মূসা (আ)-র কাছে চলে আসা সঙ্গত ছিল। এতে তাদের কর্মের প্রতি পরিপূর্ণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়ে যেত।

অপরপক্ষে হারূন (আ)-এর মত ইজতিহাদের দৃষ্টিকোণ অনুসারে ছিল এই যে, ত্যাগ করে চলে গেলে চিরকালের জন্য বনী ইসরাঈল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে এবং বিভেদ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তাদের সংশোধনের এই সম্ভাব্য পথ বিদ্যমান ছিল যে, মূসা (আ) ফিরে এলে তাঁর প্রভাবে তারা পুনরায় ঈমান ও তওহীদে ফিরে আসবে। তাই সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত কিছুদিন তাদের সাথে নম্রতা ও একত্রে বসবাস সহ্য করা দরকার। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী পালন এবং জনগণকে ঈমান ও তওহীদে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু একজন বয়কট ও বিচ্ছিন্নতা এর উপায় মনে করেছেন এবং অপরজন সংশোধন কামনার সীমা পর্যন্ত তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শনকে এ উদ্দেশ্যের জন্য উপকারী জ্ঞান করেছেন। উভয় পক্ষ সুধী, সমঝদার ও চিন্তাশীলদের জন্য চিন্তাভাবনার পাত্র। কোন এক পক্ষকে ভুল বলা সহজ নয়। মুজতাহিদ ইমামদের ইজতিহাদী মতানৈক্য সাধারণত এমনি ধরনের হয়ে থাকে। এতে কাউকে গোনাহ্গার অথবা নাফরমান বলা যায় না। মূসা (আ) কর্তৃক হারূন (আ)-এর চুল ধরে টান দেওয়ার বিষয়টি ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার খাতিরে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়া ছিল। বাস্তব অবস্থা জানার পূর্বে তিনি হারূন (আ)-কে প্রকাশ্য ভুলে লিপ্ত মনে করেছিলেন। তাঁর পক্ষ থেকে ওযর জেনে নেওয়ার পর তিনি নিজের জন্য ও তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেন।

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِيُّ ۝٩٥ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِيْ
نَفْسِيْ ۝٩٦ قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ ۖ
وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ ۚ وَانْظُرْ اِلٰٓى اِلٰهِكَ الَّذِيْ ظَلْتَ
عَلَيْهِ عَاكِفًا ۖ لَّنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝٩٧ اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ
اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝٩٨

(৯৫) মূসা বললেন ঃ হে সামেরী, এখন তোমার ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলল ঃ আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি। অতঃপর আমি সেই প্রেরিত ব্যক্তির পদচিহ্নের নিচ থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা নিক্ষেপ করলাম। আমাকে আমার মন এই মন্ত্রণাই দিল। (৯৭) মূসা বললেন ঃ দূর হ, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি ঃ 'আমাকে স্পর্শ করো না' এবং তোর জন্য একটি

নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে থাকতি। আমরা একে জালিয়ে দেবই। অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই। (৯৮) তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ্ই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। সব বিষয় তার জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[অতঃপর মূসা (আ) সামেরীর দিকে মুখ করলেন এবং] বললেন ঃ তোমার কি ব্যাপার হে সামেরী? (তুমি এ কাণ্ড করলে কেন?) সে বলল ঃ এমন বস্তু আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যা অন্যের দৃষ্টিগোচর হয়নি। (অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল ঘোড়ায় চড়ে যেদিন সাগরপারে অবতরণ করেন—সম্ভবত মুমিনদের সাহায্য ও কাফিরদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এসে থাকবেন; তারীখে তাবারীতে বর্ণিত আছে, জিবরাঈল মূসা (আ)-র কাছে এই নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন যে, আপনি তূর পর্বতে গমন করুন —সেদিন সামেরী তাঁকে দেখেছিল।) অতঃপর আমি প্রেরিত ব্যক্তির (সওয়ারীর) পায়ের নিচ থেকে এক মুষ্ঠি (মাটি) নিয়ে নিলাম (এবং আমার মনে আপনা-আপনি একথা জাগ্রত হল যে, এতে জীবনের প্রভাব থেকে থাকবে এবং যে জিনিসের ওপর নিক্ষেপ করা হবে, তা সজীব হয়ে যাবে।) সুতরাং আমি এই মুষ্ঠি (এই গো-বৎসের অবয়বে) নিক্ষেপ করলাম। আমার মনে তা'ই ভাল লেগেছে এবং পছন্দনীয় ঠেকেছে। মূসা বললেন ঃ ব্যস, তোর এই (পার্থিব) জীবনে এই শাস্তি (নির্ধারিত) আছে যে, তুই বলবি ঃ আমাকে স্পর্শ করো না এবং তোর জন্য (এই শাস্তি ছাড়াও) আরও একটি ওয়াদা (আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের) আছে, যা টলবে না (অর্থাৎ পরকালে ভিন্ন আযাব হবে।) তুই তোর মাবূদের প্রতি লক্ষ্য কর, যার ইবাদতে তুই অটল ছিলি; (দেখ) আমরা একে জ্বালিয়ে দেব, এরপর একে (অর্থাৎ এর ভস্মকে) সাগরে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেব, যাতে এর নাম-নিশানা না থাকে। তোমাদের প্রকৃত মাবূদ তো কেবল আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهٖ —(অর্থাৎ অন্যেরা যা দেখেনি, আমি তা দেখেছি।) এখানে জিবরাঈল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়ায়েত এই যে, যেদিন মূসা (আ)-র মু'জিযায় ভূমধ্যসাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায়, বনী ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যান এবং ফিরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়েত এই যে, সাগর পাড়ি দেওয়ার পর মূসা (আ)-কে

তূর পর্বতে গমনের আদেশ শোনানোর জন্য জিবরাঈল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং জিবরাঈলের হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্তে নিক্ষেপ করলে জিবরাঈল প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌঁছানোর জন্য আগমন করতেন। ফলে সে জিবরাঈলের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না।---(বায়ানুল কোরআন)

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ---রসূল বলে এখানে আল্লাহ্‌র প্রেরিত জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, জিবরাঈলের ঘোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি তুলে নিল। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে একথা বর্ণিত হয়েছে ঃ القى فى روعه انه لا يلقيها على شيئ فيقول كن كذا الاكان ---অর্থাৎ সামেরীর মনে আপনা-আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর ওপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন ঃ সামেরী ঘোড়ার পদচিহ্নের এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলম্বে সবুজ বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুঝে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব রয়েছে। (কামালায়ন) তফসীর রূহুল মা'আনীতে এ তফসীরকেই সাহাবী, তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, অতঃপর এর বিরুদ্ধে আজকালকার বাহ্যদর্শীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে। فجزاه الله خير الجزاء (বয়ানুল কোরআন)।

এরপর বনী ইসরাঈলের স্তূপীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরী করল, তখন নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভেতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্‌র কুদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি হাম্বা রব করতে লাগল। হাদীসে ফুতুনে বলা হয়েছে যে, সামেরী হারূন (আ)-কে বলেছিল ঃ আমি মুষ্ঠির ভেতরের বস্তু নিক্ষেপ করব; কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার দোয়া করবেন। হারূন (আ) তার কপটতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হারূন (আ)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিসরে পৌঁছে সে মূসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটতা করে বিশ্বাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্বাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী ইসরাঈলের সাথে সাগর পার হয়ে যায়।

فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ—হযরত মূসা (আ) সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি ধার্য করেন যে, সবাই তাকে বয়কট করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবনে এভাবেই বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবত এই শাস্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্য এবং অন্যান্য বনী ইসরাঈলীর জন্য মূসা (আ)-র তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছিল। এটাও সম্ভবপর যে, আইনগত শাস্তির উর্ধ্বে স্বয়ং তার সত্তার আল্লাহ্‌র কুদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না; যেমন এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মূসা (আ)-র বদদো-য়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত।—(মা'আলিম) এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘোরাফেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চিৎকার করে বলত ঃ لَا مِسَاسَ অর্থাৎ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।

সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি কৌতুক ঃ রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বাহ্‌রে মুহীতের বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, মূসা (আ) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন; কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন।—(বয়ানুল কোরআন)

لَنُحَرِّقَنَّهُ—(অর্থাৎ আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।) এখানে প্রশ্ন হয় যে, এই গো-বৎসটি স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে? কেননা স্বর্ণ-রৌপ্য গলিত ধাতু—দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই, প্রথমত এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বৎসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে ওঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংস-সম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হয়ে থাকলে তাকে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেওয়া এবং স্বর্ণরৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘসে ঘসে কণা কণা করে দেওয়া (দুররে মনসূর) অথবা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পোড়ানো।—(রূহুল মা'আনী) অলৌকিকভাবে দগ্ধ করাও অবান্তর নয়। —(বয়ানুল কোরআন)

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا
ذِكْرًا ﴿٩٩﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾ خَالِدِينَ

فِيْهِ ۙ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ وَنَحْشُرُ
الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾ يَّتَخَافَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾
نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ اِذْ يَقُوْلُ اَمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةً اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا
يَوْمًا ﴿١٠٤﴾ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا
قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا ﴿١٠٧﴾ يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ
الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ ۚ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ
اِلَّا هَمْسًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ
وَرَضِيَ لَهٗ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ
بِهٖ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ۭ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ
ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ
ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفْنَا فِيْهِ
مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعٰلَى
اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ
وَحْيُهٗ ۡ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴿١١٤﴾

(৯৯) এমনিভাবে আমি পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদ আপনার কাছে বর্ণনা করি। আমি আমার কাছ থেকে আপনাকে দান করেছি পড়ার গ্রন্থ। (১০০) যে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন বোঝা বহন করবে। (১০১) তারা তাতে চিরকাল থাকবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্য মন্দ হবে। (১০২) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদেরকে সমবেত করব নীল চক্ষু অবস্থায়। (১০৩) তারা চুপিসারে পরস্পরে বলাবলি করবেঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করে-

ছিলে। (১০৪) তারা কি বলে, তা আমি ভালোভাবে জানি, তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পথের অনুসারী সে বলবেঃ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে। (১০৫) তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। অতএব আপনি বলুনঃ আমার পালনকর্তা পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন। (১০৬) অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। (১০৭) তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। (১০৮) সেই দিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক-সেদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহ্‌র ভয়ে সব শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে। সুতরাং মৃদু গুঞ্জন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না। (১০৯) দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না। (১১০) তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না। (১১১) সেই চিরঞ্জীব চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখ মণ্ডল অবনমিত হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে। (১১২) যে, ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, সে জুলুম ও ক্ষতির আশংকা করবে না। (১১৩) এমনিভাবে আমি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্‌ভীরু হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়। (১১৪) সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্ মহান। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআনে গ্রহণের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুনঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বাপর সম্পর্কঃ সূরা তোয়া-হায় আসলে তওহীদ, রিসালত ও পরকালের মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা পরম্পরার মধ্যে পয়গম্বরদের ঘটনাবলী এবং মূসা (আ)-র কাহিনী বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুহাম্মদ (সা)-এর রিসালতও সপ্রমাণ করা হয়েছে। সেই রিসালতে মুহাম্মদী সপ্রমাণের অংশ বিশেষ আলোচ্য আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে যে, একজন উম্মী নবীর মুখে এ ঘটনা ও কাহিনী ব্যক্ত হওয়া রিসালত, নবুয়ত ও ওহীর প্রমাণ। কোরআনই এসবের উৎস। কোরআনের স্বরূপ প্রসঙ্গে পরকালেরও কিছু বিবরণ এসে গেছে।)

[আমি যেমন মূসা (আ)-র কাহিনী বর্ণনা করেছি] এমনিভাবে আমি পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদও আপনার কাছে বর্ণনা করি (যাতে নবুয়তের প্রমাণাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমি নিজের কাছ থেকে আপনাকে একটি নসীহতনামা দান করেছি; (অর্থাৎ কোরআন এতে উপরোক্ত সংবাদাদি আছে। অলৌকিকতার কারণে এই কোরআন নিজেও স্বতন্ত্রদৃষ্টিতে নবুয়তের প্রমাণ। এই নসীহতনামাটি এমন যে) যে এ থেকে (অর্থাৎ এর বিষয়বস্তু মেনে নেওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কিয়ামতের দিন (আযাবের) ভারী বোঝা বহন করবে। তারা তাতে (অর্থাৎ আযাবে চিরকাল থাকবে এবং এই বোঝা কিয়ামতের দিন তাদের জন্য মন্দ বোঝা হবে। যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক

দেওয়া হবে (ফলে মৃতরা জীবিত হয়ে যাবে এবং আমি সেদিন অপরাধী (অর্থাৎ কাফির)-দেরকে (কিয়ামতের মাঠে) নীল-চক্ষু অবস্থায় (বিশ্রীরূপে) সমবেত করব (নীলাভ হওয়া চোখের শূন্যতার রঙ। তারা সন্ত্রস্ত হয়ে) পরস্পরে চুপিসারে কথা বলবে (এবং একে অপরকে বলবে) তোমরা (কবরে) মাত্র দশদিন অবস্থান করেছ। (উদ্দেশ্য এই যে, আমরা মনে করতাম মরার পর পুনরায় জীবিত হব না। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। জীবিত না হওয়া তো দূরের কথা, দেরীতে জীবিত হওয়াও তো হল না। আমরা এত দ্রুত জীবিত হয়ে গেছি যে, মনে হয় মাত্র দশদিন অবস্থান করেছি। কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য, আতঙ্ক ও পেরেশানীই এরূপ মনে হওয়ার কারণ। এর সামনে কবরে অবস্থানের সময় খুবই কম মনে হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ) যে (সময়) সম্পর্কে তারা বলাবলি করে, তা আমি ভালোভাবে জানি (যে, তা কতটুকু) যখন তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সঠিক সে বলবে ঃ না, তোমরা মাত্র একদিন (কবরে) অবস্থান করেছ। (তাকে সঠিক বলার কারণ এই যে, এই দিবসের দৈর্ঘ্য ও আতঙ্কের দিক দিয়ে একথাই সত্যের অধিক নিকটবর্তী। সে ভয়াবহতার স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করেছে। কাজেই তার অভিমত প্রথমোক্ত ব্যক্তির চাইতে উত্তম। এর কথা সম্পূর্ণ নির্ভুল—এটা বলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা আসল সময়সীমার দিক দিয়ে বর্ণিত উভয় পরিমাণই ভুল এবং বক্তাদের উদ্দেশ্যও তা নয়।) এবং [হে নবী (সা) কিয়ামতের অবস্থা শুনে] তারা (অর্থাৎ কেউ কেউ) আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে (যে, কিয়ামতে এদের কি অবস্থা হবে)। অতএব আপনি বলুন ঃ আমার পালনকর্তা এগুলোকে (চূর্ণ-বিচূর্ণ করে) সমূলে উড়িয়ে দেবেন অতঃপর পৃথিবীকে সমতল মাঠ করে দেবেন, যাতে তুমি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) অসমতা ও (পাহাড় টিলা ইত্যাদির) উচ্চতা দেখবে না। সেই দিন সবাই (আল্লাহ্র) আহবানকারীর (অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুঁ করত ফেরেশতার) অনুসরণ করবে (অর্থাৎ সে শিঙ্গার আওয়াজ দ্বারা সবাইকে কবর থেকে আহবান করবে। তখন সবাই বের হয়ে পড়বে)। তার সামনে (কারও) কোন বক্রতা থাকবে না (অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন পয়গম্বরদের সামনে বক্র হয়ে থাকত—বিশ্বাস স্থাপন করত না, কিয়ামতে ফেরেশতার সামনে কবর থেকে জীবিত বের হবে না, তারা এমন বক্রতা করতে পারবে না।) এবং (আতঙ্কের আতিশয্যে) আল্লাহ্র সামনে সব শব্দই ক্ষীণ হয়ে যাবে। অতএব (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি হাশরের মাঠের দিকে চুপে চুপে চলার পদশব্দ ব্যতীত অন্য কিছু (আওয়াজ) শুনবে না। (হয় এ-কারণে যে, তখন তারা কথাই বলবে না; তবে ওপরে বর্ণিত يَتَخَافَتُونَ থেকে বোঝা যায় যে, অন্য জায়গায় তারা আস্তে আস্তে কথা বলবে। না হয় এ কারণে যে, তারা খুবই ক্ষীণস্বরে কথা বলবে, যা একটু দূর থেকেও শোনা যাবে না।) সেদিন (কারও) সুপারিশ (কারও) উপকারে আসবে না; কিন্তু (পয়গম্বর ও নেক লোকদের সুপারিশ) এমন ব্যক্তির (উপকারে আসবে) যার জন্য (সুপারিশ করার জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা (সুপারিশকারীদেরকে) অনুমতি দেবেন এবং যার জন্য (সুপারিশকারীর) কথা পসন্দ করবেন। (অর্থাৎ মু'মিন ব্যক্তি। সুপারিশকারীদেরকে মু'মিনের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন এবং এ সম্পর্কে

সুপারিশকারীর কথা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পসন্দনীয় হবে। কাফিরদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেওয়া হবে না। সুতরাং উপকারে না আসার কারণ হবে সুপারিশ না করা। এ আয়াতে আপত্তিকারী কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে, তোমরা তো সুপারিশ থেকেও বঞ্চিত থাকবে।) তিনি (আল্লাহ্) জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর জ্ঞাত বিষয়কে) এদের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে না। (অর্থাৎ এমন কোন বিষয় নেই, যা সৃষ্টজীব জানে এবং আল্লাহ্ তা'আলা জানেন না; কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে, যা আল্লাহ্ তা'আলা জানেন এবং সৃষ্টজীব জানে না। সুতরাং যেসব অবস্থার কারণে সৃষ্টজীব সুপারিশের যোগ্য ও অযোগ হয়, সেগুলোও তিনি জানেন। অতএব যোগ্য লোকদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি সুপারিশকারীদেরকে দেওয়া হবে এবং অযোগ্য লোকদের জন্য এ ক্ষমতা দেওয়া হবে না।) এবং (সেদিন) সব মুখমণ্ডল সেই চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ীর সামেনে অবনমিত হবে (এবং সব অহঙ্কারী ও অবিশ্বাসীর অহঙ্কার ও অবিশ্বাস খতম হয়ে যাবে) এবং (এ ব্যাপারে সবার অবস্থা একইরূপ হবে। অতঃপর তাদের মধ্যে এরূপ পার্থক্য হবে যে) সে ব্যক্তি (সর্বতোভাবে) ব্যর্থ হবে, যে জুলুম (অর্থাৎ শিরক) নিয়ে আসবে আর যে ঈমানদার অবস্থায় সৎকর্ম করেছে, সে (পূর্ণ সওয়াব পাবে) কোন অবিচার ও ক্ষতির আশংকা করবে না যেমন আমলনামায় কোন গোনাহ্ বেশি লিখে দেওয়া অথবা কোন সৎকর্ম লিপিবদ্ধ না করা। এ কথা বলে পূর্ণ সওয়াব বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এর বিপরীতে কাফিরদের যে সওয়াব হবে না---একথা বলা উদ্দেশ্য। কারণ সওয়াব প্রাপ্য হওয়ার মত কোন কাজ তাদের নেই। তবে জুলুম ও অবিচার কাফিরদের সাথেও করা হবে না। তবে তাদের সৎকর্মসমূহ হিসেবে লিপিবদ্ধ না করা কোন জুলুম নয়; বরং তাদের কাজ ঈমানের শর্তমুক্ত হওয়ার কারণে ধর্তব্য নয়। আমি (যেমন উল্লিখিত বিষয়বস্তুসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি) এমনিভাবে একে (এ সবকিছুকে) আরবী ভাষায় কোরআনরূপে নাযিল করেছি। (যার ভাষা সুস্পষ্ট)। আমি এতে (কিয়ামত ও আযাবের) সতর্কবাণী নানাভাবে বর্ণনা করেছি (ফলে, এর অর্থও ফুটে উঠেছে; উদ্দেশ্য এই যে, আমি সমগ্র কোরআনের বিষয়বস্তু পরিষ্কার বর্ণনা করেছি) যাতে তারা (শ্রোতারা এর মাধ্যমে পুরোপুরি) ভয় পায় (এবং অনতিবিলম্বে বিশ্বাস স্থাপন করে অথবা সম্পূর্ণ ভয় না পেলেও এই কোরআন দ্বারা তাদের কিছুটা বোধোদয় হয়। (অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিক্রিয়া না হলে অল্পই হোক। এমনিভাবে কয়েকবার অল্প অল্প একত্রিত হয়ে পরিমাণে যথেষ্ট হয়ে যায় এবং তা পরে কোন সময় মুসলমান হয়ে যায়।) সত্যিকার অধীশ্বর আল্লাহ্ মহান (যিনি এমন উপকারী কালাম নাযিল করেছেন।) আর (উপরোল্লিখিত সৎকর্ম করা ও উপদেশ মেনে নেওয়া যেমন কোরআন প্রচারের একটি জরুরী হক, যা আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয, তেমনিভাবে কোরআন অবতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় আদবের প্রতি যত্নবান হওয়াও আপনার দায়িত্ব। তন্মধ্যে একটি এই যে, আপনার প্রতি এর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন (পাঠে) তৎপর হবেন না। (কারণ এতে আপনার কষ্ট হয়। জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা এবং পাঠ করা একই

সাথে করতে হয়। অতএব এরূপ করবেন না এবং ভুলে যাওয়ার আশঙ্কাও করবেন না। মুখস্থ করানো আমার কাজ। এবং আপনি (মুখস্থ হওয়ার জন্য আমার কাছে) এই দোয়া করুন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (এর মধ্যে অর্জিত জ্ঞান স্মরণ থাকার, যে জ্ঞান অর্জিত হয়নি তা অর্জিত হওয়ার, যে জ্ঞান অর্জিত হওয়ার নয় তা অর্জিত না হওয়াকেই উত্তম ও উপযোগী মনে করার এবং সব জ্ঞানে সুবুদ্ধির দোয়া শামিল রয়েছে। অতএব لا تعجل-এর পর এর বর্ণনা খুবই সমীচীন হয়েছে। মোটকথা এই যে, মুখস্থ করার উপায়াদির মধ্য থেকে ত্বরা পাঠ করার উপায় বর্জন করুন এবং দোয়া করার উপায় অবলম্বন করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا---বিশিষ্ট তফসীরবিদদের সর্বসম্মত মতে এখানে ذكر বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে।

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا---অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিয়ামতের দিন সে বিরাট পাপবোঝা বহন করবে। কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে ; যথা কোরআন তিলাওয়াত না করা, কোরআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা, কোরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, শুদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্নে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্মান লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনিভাবে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার চেষ্টা না করাও কোরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বোঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরানো। মোটকথা, কোরআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় গোনাহ্। কিয়ামতের দিন এই গোনাহ্ ভারী বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দকর্ম ও গোনাহ্কে কিয়ামতের দিন ভারী বোঝার আকারে পিঠে চাপানো হবে।

يُنفَخُ فِي الصُّورِ---হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন ঃ জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করল ঃ صور (ছুর) কি? তিনি বললেন ঃ শিং। এতে ফুঁৎকার দেওয়া হবে। অর্থ এই যে, صور শিং এর মতই কোন বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুঁৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ---সহীহ্ হাদীসে

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহীর প্রারম্ভিককালে যখন জিবরাঈল কোন আয়াত নিয়ে এসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে শুনাতেন, তখন তিনি তাঁর সাথে সাথে আয়াতটি পাঠ করারও চেষ্টা করতেন, যাতে আয়াতটি স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এতে তাঁর দ্বিগুণ কষ্ট হত---আয়াতকে জিবরাঈলের কাছ থেকে শোনা ও বোঝার কষ্ট এবং সাথে সাথে মনে রাখার জন্য মুখে পাঠ করার কষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা কিয়ামতের لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র জন্য ব্যাপারটি সহজ করে দিয়েছেন যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করা আপনার দায়িত্ব নয়---এটা আমার দায়িত্ব। আমি নিজেই আপনাকে মুখস্থ করিয়ে দেব। তাই জিবরাঈলের সাথে সাথে পাঠ করার এবং জিহবা নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু নিবিষ্ট মনে শুনে যাবেন। তবে এরূপ দোয়া করে যাবেন رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

---হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন। কোরআনের যে অংশ অবতীর্ণ হয়েছে, তা স্মরণ রাখা, যে অংশ অবতীর্ণ হয়নি, তা প্রার্থনা করা এবং কোরআন বোঝার তওফীকও এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত।

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ اِلٰٓى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَ
اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى ﴿١١٦﴾
فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ
الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ﴿١١٧﴾ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ﴿١١٨﴾ وَ
اَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾ فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ
قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾
فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ
فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ﴿١٢٢﴾ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا ۢ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ